# ধ্রুবতারা

Central Texas Bengali Association, Austin, Texas
October 2025 | বঙ্গাব্দ ১৪৩২

Austin Children's Academy

Established 2007

ENROLL NOW

PROMO: $200 OFF
CODE: CTBA2025

# AWARD WINNING MONTESSORI SCHOOL

- Trusted by 2,500 Families for 18+ Years
- Tenured Montessori Certified Teachers
- Low Staff Turnover + Small Classroom Ratios
- Personalized Curriculum + STEM Education
- Spanish Immersion + Dual Language Program

Official Exclusive Education Partner of:

CBA
Central Texas Bengali Association
Come Celebrate the Bengali in you

Schedule Your Tour:

(512) 271-2231

www.AustinChildrensAcademy.org

Scan for More Information:

# সুচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| Cover picture – Maa Durga | Sanghita Chowdhury | 1 |
| Executive Committee | | 5 |
| সম্পাদকীয় | শুভা আঢ্য । দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী | 6 |
| President's Corner | Dibyajyoti Bhattacharji | 8 |
| CTBA Activities 2025 | | 9 |
| ভুলভুলাইয়া | সুস্মিতা সেন | 10 |
| Sea world | Pihan Nandy (7) | 15 |
| ঠাকুর তোমায় ছাড়ছি না | শ্রীপর্না ভট্টাচার্য্য | 16 |
| অরোরা বোরিয়ালিস | মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী | 17 |
| Photo – Incredible India | Rumku Chowdhury | 22 |
| গভীর রহস্য | মালবিকা বসু | 23 |
| Photo – I am the King | Ratula Sarkar | 24 |
| Art – Ariel the Mermaid | Sharanya Chatterjee (6) | 24 |
| Art – Unicorn | Sharanya Chatterjee (6) | 24 |
| তন্ত্র | তুষ্কিক ঘোষ | 25 |
| Art – The Siren's Silence | Sreeja Dutta (12) | 27 |
| Art – Rhythm of the Streets | Sreeja Dutta (12) | 27 |
| চতুর্ভুজ | অমিয় বাসু | 28 |
| এঁচোড়ে পাকা | সুদীপ সরকার | 32 |
| Comics – অসুর পুজো | অয়ন গুহ | 34 |
| লেগেসি | সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় | 38 |
| Photo – Apart from Modernisation | Rumku Chowdhury | 40 |
| পথে চলে যেতে যেতে | শুভা আঢ্য | 41 |
| অলওয়েস কানেক্টড | শুভ্র চ্যাটার্জি | 42 |
| Art – Owl | Idhant Chakravarty (12) | 43 |
| Art – Sobuj Rajar Desh | Kenosha Mahbub (4) | 43 |
| Art – Notun sokal | June Bhattacharya (7) | 43 |
| প্রতীক্ষা | স্নিগ্ধা ঘোষাল | 44 |
| Mailbox অভিযান | ঋত্বিক সেন | 45 |
| Art – Hemanter Ronge Sheetboron | Arunangshu Saha (7) | 47 |
| Art – Believe yourself | Rajonya Saha (9) | 47 |
| Art – Sunrise at Moraine Lake | Adrita Sengupta (11) | 47 |
| মীটিং | প্রদীপ্ত দে | 48 |
| হাইটেক ঘটকালি | কেকা বসু দেব | 52 |

| | | |
|---|---|---|
| অপূর্ব স্পর্শ | শান্তি কুমার ব্যানার্জী | 54 |
| Art – Ladybird Lake | Prajkta Bhattacharjee (12) | 55 |
| ফানুস | প্রবাল দাশগুপ্ত | 56 |
| নকশি কাঁথা জীবন গাঁথা | প্রবাল দাশগুপ্ত | 56 |
| মায়া ও মহামায়া | দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী | 57 |
| নুতন- পুরাতন | পাপিয়া দাশগুপ্ত | 58 |
| আমার জবা | পাপিয়া দাশগুপ্ত | 58 |
| Solitude | Aruneet Dasgupta | 58 |
| একলা পথে | দেবযানী দাশগুপ্ত | 59 |
| Oh Banff | Ishaan Sengupta (12) | 59 |
| PEI & NOVA SCOTIA, Canada | Rupa Mukherjee | 60 |
| Newfoundland | Shantanu Ganguly | 61 |
| Spring in Texas! | Joyeeta Banerjee | 63 |
| Art – Ma Durga | Aarav Guha (11) | 64 |
| Art – Tesla world | Andreas Dutta (7) | 64 |
| Art – Nana Rong | Arina Dutta (5) | 64 |
| When the Trains Stopped Chugging! | Debasree DasGupta | 65 |
| Art – Lord Shiva & Goddess Parvati | Ishani Gupta | 67 |
| Art – Pujarini | Paramita Dasgupta | 67 |
| Photo – Nivasha Lake Kenya Birds Planet | Rumku Chowdhury | 67 |
| The hike to Grinnel Glacier | Mahati Ramya Adivishnu | 68 |
| New Graduates | | 71 |
| Pandal decoration behind the scenes | | 72 |
| Art – Ganesh | Cynthia Ceil | 73 |


## Sponsor Adverts


| | | | |
|---|---|---|---|
| Austin Children's Academy | 2 | Prime Family care | 51 |
| Shiva Jewelers | 5 | Trusted Realty Austin | 56 |
| Panache | 15 | Six Yards of Weave | 59 |
| Rannaghor LLC | 31 | Paint Scissors Paper | 70 |
| Chilly Air | 31 | Mathews CPA | 73 |
| Verma Insurance Agency | 51 | Sijo Vadakkan | 74 |


**DISCLAIMER**

**The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.**

# Executive Committee

Central Texas Bengali Association | www. ctbaaustin.org

| | |
|---|---|
| **President** | Dibyajyoti Bhattacharji |
| **Vice President** | Arjun Pal Chowdhury |
| **Treasurer** | Abhirup Mazumder |
| **Gen. Secretary** | Pushpak Bhattacharjee |

### Cultural Committee

Basundhara Raychaudhuri
Rimli Sengupta

### Magazine Committee

Subha Addy
Ritwik Sen
Debasmita Paul Chatterjee

### Sponsorship & Technology

Diganta Sengupta
Arnab Kumar Saha

### Pujo Committee

Anindita Roy Bardhan
Rupa Mukherjee
Samira Ghosh
Suma Dasgupta
Shreosi Dutta Bhattacharyya
Tina Banerjee
Nilam Roy

### Photography and Videography

Bivas Das

### Operational Excellence & Pandal Decoration

Asish Das
Sukhasis Basu Roy
Rumel Saha
Subhadip Das
Chiranjib Paul

### Food Committee

Srirupa Chatterjee
Priyanka Bhowmick
Debayan Saha
Avijit Sarkar
Arnab Banerjee

# সম্পাদকীয় – শুভা আঢ্য

"দিগন্তে ওই বৃষ্টিহারা মেঘের দলে জুটি
লিখে দিলো----আজ ভুবনে
আকাশ ভরা ছুটি।"-- কবি রবি

পুজোর ছুটি! আমাদের অনেকেরই মনের পটে ধরে রাখা এক অপরূপ ছবি । এখনো চোখ বুজলে দেখতে পাই, বর্ষা ধোয়া মেঘহীন উজ্বল নীল আকাশ, ঘাসের ওপর শিউলি ফুলের আলপনা, কাশ ফুলের দোল-দোলানি, কান পাতলে যেন এখনো শুনতে পাই মা দুগ্গার আগমনী স্তোত্রের ছন্দ, মঙ্গল শঙ্খধ্বনি আর পুজো বাড়ির ঢাকের আওয়াজ । মনের আঙিনায় ভিড় করে হাজির হয়, নতুন শাড়ি জামার রঙিন সমারোহ, বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ আড্ডা, পূজা সংখ্যার পাতার গন্ধ, আর অনাবিল আনন্দ মাখা, একমুঠো সোনালী দিনের স্মৃতি।

পুজো এখনো হয়, তবে সাত সাগরের পারে, টেক্সাসের অস্টিন শহরে, পুজোর ছবিটা একটু অন্য রকমের। হোক না শরতের প্রারম্ভ, এখানে এখনো গ্রীষ্মের দাবানল প্রবল প্রতাপে আমাদের অস্থির করে তুলছে। এহেন সময়ে, একদিন কম্পিউটার এর মাধ্যমে, খবর আসে---পূজার আর দেরি নেই ! মা আসছেন! দিন স্থির করতে হয়,--- নাঃ, পঞ্জিকার পাতা দেখে নয়, তার কাছাকাছি সুবিধা মতো উইক-এন্ডএ ও অনুকূল পূজা ক্ষেত্রের availability র ওপর নির্ভর করে !! তবুও পুজো আসছে শুনলে কি চুপটি করে থাকা যায়?

নাইবা পেলাম শিউলি আর কাশ ফুলের দেখা, কিংবা হঠাৎ প্রকৃতির আকাশ জুড়ে ঝড়ের পূর্বাভাস, তবুও ওই পুজোর দু-তিনটি দিন, আমাদের কাছে এনে দেবে সেই মন কেমন করা পুরোনো দিনের ছবি, ---আগমন হবে স্বপুত্র-কন্যা সহ মহামায়া মায়ের, বাজবে ঢাক, বন্ধুর পাবো দেখা, পুজোর গানের সুরে ভরে উঠবে মন। আর পূজা সংখ্যা? সে তো থাকবেই, যেমন অস্টিনের প্রতিটি পুজোয় থেকেছে-- আনুমানিক গত ১৯৯৬ সাল থেকে। সে সময়ে বাঙালি ছিল কম কিন্তু উৎসাহ ছিল অদম্য। হাতে লেখা, "শারদ অর্ঘ" নামের ছোট্ট পত্রিকাটির ৬-৭ পাতার মধ্যে কচি কচি হাতের রচনা আর ছবিগুলি তার সাক্ষ্য।

এই অস্টিন, ধীরে ধীরে পুরাতন আর নবীনের মেলবন্ধনে বিশালতর নবরূপ ধরেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০০৬ সাল থেকে আমাদের পুরোনো "শারদ অর্ঘ" পত্রিকাটিও নতুন আবরনে ও আয়তনে প্রকাশিত হয়েছে,-- " ধ্রুবতারা" নামে। যেমন যেমন আমাদের সভ্য সংখ্যা বর্ধিত হয়েছে তেমনি তেমনি আমাদের ধ্রুবতারা সমৃদ্ধ হয়েছে নতুন সাহিত্য ও শিল্পকলার সম্ভারে।

এবারের ধ্রুবতারাতে আমরা পেয়েছি স্থানীয় ও বিভিন্ন জায়গার গুণী লেখক ও শিল্পীদের সৃষ্টি ও তারই সঙ্গে কলম ও তুলি নিয়ে ছুটে এসেছে আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা তাদের লেখা ও ছবি নিয়ে । আপনাদের হাতে আমাদের "ধ্রুবতারা"র এই সংখ্যাটি তুলে দিতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। এটি আপনাদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ধ্রুবতারা পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই পূজার প্রীতি ও শুভকামনা ।
নমস্কারান্তে ।

ধ্রুবতারা

**DISCLAIMER**
**The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.**

# **সম্পাদকীয়** - দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী

ধ্রুবতারা পত্রিকার শারদ প্রকাশনায় সবাইকে আমন্ত্রন জানাই। আমাদের পত্রিকার একটি অন্যতম সংযোজনা ‘গল্প হোক’ একটি আলোচনা মূলক পরিবেষণ। গত তিন বছর যাবৎ বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আমাদের গল্প হোক অনুষ্ঠানে বেশ কিছু গল্প হয়েছে। আশা করি তার মাধ্যমে আমারা আপনাদের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে পেরেছি। শুধু তথ্যই বা বলি কেন! সময়োপযোগী চিন্তাধারা, কিছু আনান্দের বাক্যবিনিময়, মজার অভিজ্ঞতা আর সর্বোপরি আমাদের ভেতরের শিশুটিকে জিইয়ে রাখার জন্য একটি ছোট্ট খেলারও আয়োজন করা হয় আমাদের অনুষ্ঠানে, যেটা কিনা আমাদের অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিরাই আনন্দের সঙ্গে সবার সামনে তুলে ধরেন।

বলতে দ্বিধা নেই, আশাতীত ভাবে আমরা কিন্তু খুব ভাল সাড়া পেয়েছি আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে। এই তিন বছরে আমাদের একটি নিবেদিত দর্শক মণ্ডলীও তৈরি হয়েছে, যাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের উৎসাহ আরও বেড়েছে নতুন আরও কিছু বিষয়ে গল্প হোক এ আলোচনা করার।

সেরে ফেলি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু তথ্য বিনিময়। এবছরের যে পর্বটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সেটি হল “America the land of opportunity”। যারা ভিন্ন দেশ থেকে এই দেশে এসেছেন সে কর্মসংস্থানগত ভাবেই হোক কিংবা শিক্ষাগত প্রয়োজনে এবং আজ এই দেশের বাসিন্দা তারা কিন্তু দেখা গেছে নিজেদের দীর্ঘ দিনের সুপ্ত ইচ্ছা চরিতার্থে বা আর্থিক প্রয়োজনে বিভিন্ন রকমের ব্যাবসায় উদ্যোগী হয়েছেন বা হতে চেষ্টা চালাচ্ছেন নিরন্তর অথবা ভবিষ্যতে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহী, ঠিক এই বিষয়ে আলোকপাত করতেই আমরা এবারের আলোচনা টি মঞ্চস্থ করেছিলাম।

আমি নিশ্চিত অনেকেই বিষয়টিতে আগ্রহী হওয়া স্বত্তেও দেখে ওঠা হয়নি। তাদের জন্য বলে রাখি:

- CTBA Austin @ctbaaustin5473 YouTube channel
- https://www.ctbaaustin.org/

এই দুটি ডিজিটাল প্লাটফর্মএ আমাদের সব কটি পর্ব মজুত আছে, যেকোনো সময় চট করে উঁকি দিতে পারেন গল্প হোক-এ।

আমাদের আগামী পর্বের আগাম আমন্ত্রণ ও জানিয়ে রাখি এই বেলা। খুব শিগগিরি নতুন একটি মনগ্রাহি পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে চলেছি আমরা, বিষয়টা নাহয় উহ্যই থাকুক আপাতত!
আমাদের বিনীত অনুরোধ সঙ্গে থাকুন আপনাদেরই রোজকার গল্পে, আসুন গল্প হোক।

দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী

ধ্রুবতারা

**DISCLAIMER**
**The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.**

# President’s Corner

Dibyajyoti Bhattacharji
Austin, TX, 2025

Dear CTBA Family,As I reflect on the past two years, my heart is filled with pride and gratitude for what we, as a community, have accomplished together. These two years have been nothing short of remarkable, marked by celebration, cultural enrichment, giving back, and above all, togetherness. CTBA has successfully hosted more than 20 memorable events, each leaving a lasting impact on our community. From soulful cultural celebrations like Kobi Pronam, to children-centric festivities such as Saraswati Puja, to our charitable donation drives and above all the Durga pujas. Each initiative reflected our shared values of culture, compassion, and connection.

We also had the privilege of welcoming renowned artists such as Kavita Krishnamurthy and Madhubanti Bagchi, we had an remarkable musical evening with Madhubanti last year and looking forward to make it an unforgettable event with Kavitaji this time. None of this would have been possible without the wholehearted participation of our community members. Your energy, enthusiasm, and support have been the driving force behind every success. Equally, I want to acknowledge the tremendous effort and dedication of our Executive Committee. Each member gave their time, creativity, and tireless commitment over these two years, ensuring every event was executed with excellence. Together, we have built more than just events, we’ve created memories, friendships, partnerships and a stronger sense of belonging for everyone.

As this will be my last year serving as President, I feel truly grateful for the opportunity to serve such a vibrant community. I look forward to continuing my support for the upcoming teams and cheering on CTBA’s future successes.

With heartfelt gratitude and best wishes,
Dibyajyoti Bhattacharji
President, Central Texas Bengali Association (2024-2025)

**DISCLAIMER**
**The views, thoughts and opinions expressed in this magazine belong solely to the authors and do NOT reflect the views or the official position of the Central Texas Bengali Association.**

# CTBA Activities 2025

## CTBA Saraswati Puja Celebration & Children Art competition

## Kobipronaam

## Clothes Donation Drive

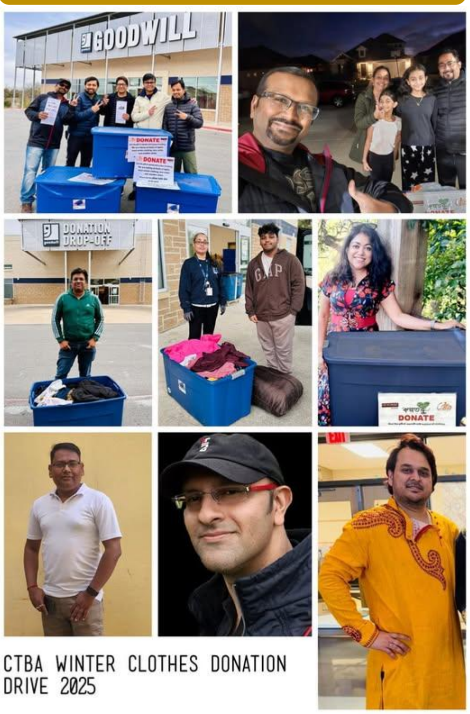


## Music Night

## Anandamela

## Golpo Hok

## Art Camp

## Annual Picnic

**CTBA Lakshmi Puja 2025**

Sunday, Oct 12

4:00 PM – 9:00 PM

**Live Oak Elementary School**

# ভুলভুলাইয়া

## সুস্মিতা সেন

জানলা দিয়ে বাইরে বরফ পড়া দেখছিলাম। একটু আগেও বাইরে রোদ্দুর ছিল। আর এখন আকাশ থেকে ঝিরঝির করে পাউডারের গুড়োর মতো বরফ পড়ছে। বাড়ির সামনের কালো পিচ বাঁধানো রাস্তাটা প্রথমে কাঁচা পাকা চুলের স্টাইল লাগছিল। আর এখন পুরোটাই যেন এক ঢাল পাকা চুল। রাস্তার দুপাশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা পাইন গাছের সূঁচের থোকার মতো পাতাগুলিও সাদা হয়ে গেছে। চারপাশের বাড়িগুলোর মাথায় বরফ জমে কার্নিসের উপর থেকে ঝুলছে। উল্টোদিকে আমার বন্ধু ইরফানের বাড়ির সামনে ওর আব্বুর পুরোনো মারুতি ভ্যানটার মাথায়ও বরফ জমেছে। আমি ঠিক জানি, কাল সকালে গাড়ীটা যখন start নেবে না তখন ইরফানের আব্বু, সওকত চাচা বুখারার আগুন নিয়ে গাড়ীর তলায় তাপ দিয়ে গাড়ী start করবে। ইরফান বলে গাড়ীটা ওর আব্বুর পুরানা দোস্ত। বরফ পড়লে দোস্তের মন খারাপ হয়ে যায়। আবার তাপ পেলে খুশি হয়ে ওঠে। ছোটবেলায় বরফ পড়তে শুরু করলেই আমি আর আমার পাড়ার সব বন্ধুরা বাইরে বেড়িয়ে পড়তাম। রাস্তায় নেমে বরফ ছোড়াছুড়ি করতাম। ইরফান সুন্দর Snowman বানাতো। আর সুরিন্দর ওর একটা shirt আর টুপি এনে Snow man কে পড়িয়ে দিত। আর একটা মজার খেলা ছিল। আমীরদের বাড়ির সামনের বরফ জমা উঁচু রাস্তাটা থেকে slip খেয়ে, গড়িয়ে নিচে নেমে আসতাম।

এখন আমার বরফ একদম ভালো লাগে না। মনে হয় আমি যেন সওকত চাচার পুরোনো মারুতিটার মত ঠান্ডায় জমে গেছি। কিন্তু মানুষ কি কখনো গাড়ীর মতো হতে পারে?
অনেকটা জায়গা নিয়ে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু পীরপাঞ্জাল পর্বতের পায়ের কাছে একটা সবুজ উপত্যকার ছোট্ট একটা শহরে আমাদের বাড়ি। এপ্রিল মাসে চারিদিকের বরফ যখন গলতে থাকে, তখন পাহাড়ি ঝর্ণাগুলি শীতঘুম থেকে জেগে আড়মোড়া ভেঙ্গে পাহাড়ের ফাটল থেকে বেড়িয়ে পড়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে ঝর ঝর করতে করতে নীচে নেমে আসে। সবুজ উপত্যকার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট একটা লেকে ঝর্ণারা এসে মিশে যায়। তারপর লেকের একপাশ দিয়ে ছোট পাহাড়ী নদী হয়ে নীচের দিকে বয়ে যায়। লেকের উপরের পাতলা বরফের স্তর তখন স্বচ্ছ কাচের মতো। আর চারপাশটা সাদা বরফের আস্তরন খসিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে। এই সময়টা সবচেয়ে ভাল লাগে আমার। চারিদিক কি সুন্দর। কোথাও কোনো আশান্তি নেই, দুঃখ নেই। এটাই বোধহয় বেহেস্তের মতো। আমার আব্বু এই শহরের এক হাসপাতালের ডাক্তার । ছোটবেলায় নানির কাছে শুনেছি আমার জন্মের সময় আব্বুকে কয়েক মাসের জন্য বিদেশে যেতে হয়েছিল। ক'মাস পরে বাড়িতে ফিরে গোলাপি তোয়ালেতে জড়ানো ভীষণ ফর্সা, ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে দেখেই ওর নাম রাখেন 'Firn,' ফার্ন।

স্কুলে ভর্তি হবার সময় আব্বুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার নাম 'ফার্ন' কেন। আব্বু বলেছিলেন, "আকাশ থেকে যখন ঝির ঝির করে বৃষ্টির মতো প্রথম বরফ পড়ে, সেই হালকা বরফকে বলে তুষার বা SNOW। আর ক'দিন পরে ভেতরের হাওয়া বেড়িয়ে গিয়ে একটু দানা বাঁধলে তাকে বলে Firn। আর পুরো শক্ত হয়ে গেলে হয়ে যায় বরফ বা ICE। আমি প্রথম যেদিন তোকে দেখেছিলাম তখন আমার Snow Fall, ছোট্ট সোনার ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে, হাসতে শিখে গেছে। কিন্তু তখনো দাঁড়াতে শেখে নি। তাই তখন তোর নাম দিলাম 'ফার্ন'। আমার কাছে চিরকাল তুই ফার্নই থাকবি, বরফ হয়ে যাবি না।" আমার নানির এই নাম একদম পছন্দ ছিল না। তাঁর কাছে আমি ছিলাম 'খুসবু'। মায়ের ইচ্ছায় স্কুলে আমার নাম হল ফারহানা মানে Joyful ।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমার কাশ্মীরি মুসলমান আব্বু অল্প বয়সে কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে গিয়ে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সহপাঠিনী সর্বানীর প্রেমে পড়েছিলেন। এবং মায়ের বাড়ির তীব্র আপত্তি স্বত্তেও মা সব ছেড়ে আব্বুর সঙ্গে কাশ্মীরে চলে এসেছিলেন। আব্বুর বাড়ির সবাই মা কে ভালোবেসে গ্রহণ করেছিল। মা এখন 'শবনম বিবি'। মা এখন বাড়িতেই Chamber খুলে ডাক্তারী করে।

আমাদের বড়িতে নানি খুব ধার্মিক। নামাজ পড়ে, কোরান পড়ে, এক মাস ধরে রোজা পালন করে। আব্বু এক ওয়ক্ত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন না। মা নানির সঙ্গে একমাস ধরে রোজা পালন করলেও প্রতি Thursday সারাদিন fasting করে সন্ধ্যাবেলা মায়ের শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের একটা ড্রয়ারে সাজিয়ে রাখা পিতলের ছোট্ট লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তির সামনে পাঁচালি পড়ে। যে যার মতো ঈশ্বরকে ডাকে, কেউ কাউকে বাঁধা দেয়না। নানির কোরান পাঠের একাগ্র শ্রোতা আমার মা। আবার মায়ের মুখে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে শুনতে জনম দুখিনী সীতার জন্য নানির দুচোখ পানিতে ভরে যায়। কিন্তু দ্রৌপদীর পাঁচ জন খসম নানি কিছুতেই মানতে পারত না।

আব্বু তাঁর ছোটবেলার গল্প বলেন। এক সাধারণ শালওয়ালার ছেলের কঠিন সংগ্রামের গল্প। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়তে যাওয়া, সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, কফি হাউসের আড্ডা। কলকাতা ছিল আব্বু ভালোবাসার শহর, আর কাশ্মীরের এই ছোট্ট শহরটা আব্বুর প্রাণের শহর।

মা আমাকে বলেছিল তাকে যেন আম্মি না ডেকে মা বলি। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ইরফান আমার মা ডাকা নিয়ে খুব আপত্তি করতো। ও বলতো আম্মি ডাকতে হয়। মা হল অন্য ভাষা। আমি বুঝতে পারতাম না, 'মা' শব্দটা কি করে অন্য ভাষা হয়।

সুন্দর ছবির মতো আমার শৈশব, কৈশোর বাড়ি, স্কুল আর বন্ধুদের সঙ্গে কেটে গেল। শুধু ইরফান কেমন যেন বদলে যাচ্ছিল। খুব গম্ভীর আর বদমেজাজী হয়ে উঠছিল। কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতো। আমাদের বাড়িতে আসা একদম বন্ধ করে দিয়েছিল। সওকত চাচার একটা মুদির দোকান ছিল। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার পরে ইরফান কিছুদিন দোকানে যাচ্ছিল। একদিন শুনলাম, ইরফান শ্রীনগরে কোন বড় কলেজে ভর্তি হয়েছে। ওখানে ওর চাচার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করবে। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। চলে যাবার আগে ইরফান একবারও আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না।

আমি এখানের কলেজে ভর্তি হলাম। বছর প্রায় ঘুরে এল। ঈদের ছুটিতে ইরফান বাড়ি এসেছিল। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য্য লেগেছিল ওকে দেখে। এ যেন সেই ইরফান নয়, অন্য কেউ। ওর চেহারায় রুক্ষ ভাব। কথাবার্তার ধরন বদলে গেছে। বড় বেশি আল্লা আর বেহস্তের কথা বলছিল। আমি বললাম,"ইরফান এবার 15th August আসতে পারবি? ঐ দিন আমাদের স্কুলের Golden Jubilee। এবার Independence Day তে সারাদিন ধরে অনেক অনুষ্ঠান হবে। সব Ex Student দের participate করার জন্য message পাঠিয়েছে।"
ইরফান আমার কথা শুনে খুব ক্ষেপে গেল। চিৎকার করে বললো, "15th August India র Independence Day, আমাদের নয়। আমাদের Independence যেদিন পাবো সেদিন celebrate করবো। তুই তোর মা'র কাছে থাক। কাশ্মীরিদের কষ্ট তোরা বুঝবি না।"

আমি কিছুই বুঝতে বুঝতে পারছিলাম না। পাগলের মতো কি সব বলছে। আমাদের স্বাধীনতা আর ওদের স্বাধীনতা কিসে আলাদা। আর আমি কি কাশ্মীরি নই? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো।
ইরফানের ব্যবহারে খুব কষ্ট পেয়ে বাড়ি ফিরে নানির কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। নানি আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইরফানের সব কথা জিজ্ঞাসা করছিল। সব শুনে নানি খুব গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আমাকে বললো, "তুমি আর ইরফানের সঙ্গে কথা বলবে না। ও ভুল পথে পথে যাচ্ছে।" ইরফানের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।
এর পরেও বছর ঘুরে গেল। আবার Snowfall হলো। চারিদিক বরফে ঢেকে গেল। আবার বরফ গলে চারিদিক সবুজ হল। এই রকম এক বরফ ঝরা রাতে নানি আমাদের সবাইকে ছেড়ে আল্লার কাছে চলে গেল।
এবার আব্বু আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাবেন। সব গোছানো হয়ে গেছে। পরের দিন সকালেই আব্বু বেড়িয়ে পড়বেন। আমরা তাড়াতাড়ি dinner শেষ করে Drawing Room এ বসে গল্প করছিলাম। তখন দরজার Bell বাজল। ঘড়িতে তখন রাত ন'টা। এখানে গভীর রাত্রি। আব্বু একটু চিন্তিত হয়েই দরজা খুললেন। দরজার বাইরে সওকত চাচা দাঁড়িয়েছিল। সওকত চাচাকে এত রাত্রে দেখে আমরা সবাই খুব অবাক হয়েছিলাম।
সওকত চাচা বললেন, "ডক্টর সাব, কাল সকালে আপনি আবার বিদেশ যাচ্ছেন, তাই দেখা করতে এলাম। আপনি তো শ্রীনগর থেকে Flight ধরবেন। আমার একটা উপকার করবেন?"
আব্বু বললেন, "আরে এত শরম করছেন কেন সওকত ভাইয়া? বলুন কি করতে হবে?"
সওকত চাচা আকুল ভাবে বললেন, "সময় থাকলে একবার ইরফানের কলেজের Hostel এ গিয়ে দেখবেন ও কেমন আছে। অনেক দিন আগেই ওর চাচার বাড়ি ছেড়ে Hostel এ চলে গেছে। Airport এর পাশেই ওর Hostel। এখন বেশির ভাগ সময়ই Network থাকছে না। ওর Mobile ও বন্ধ হয়ে আছে। অনেক দিন ধরে ওকে Phone এ পাচ্ছি না। খুব চিন্তা হচ্ছে।"
আব্বু কথা দিলেন নিশ্চই ইরফানের খোঁজ নেবেন। আর দেখা হলে ইরফানের সঙ্গে সওকত চাচার কথা বলিয়ে দেবেন।

পরের দিন রাতে Delhi থেকে London এর Flight এ Boarding এর আগে সওকত চাচার mobile এ আব্বুর phone এসেছিল। ইরফান ওর Final Semester দেয় নি। বন্ধুরা বলেছে কাউকে কিছু না বলে ও বাড়ি চলে গেছে। বন্ধুরা কেউ ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি।
সওকত চাচা, চাচী, মা সবার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া, কপালে ভাঁজ। কেউ কোনো কথা বলছিল ন। সবাই ভাবছিল, কি হল ইরফানের? কোথায় চলে গেল সে? কাশ্মীরের অবস্থা এখন মোটেও ভাল নয়।আমাদের এই শহরে কোনো অশান্তির খবর নেই। তবে এখন আমাদের দুই প্রতিবেশী পরিবারের মনে অশান্তির ঝড় বইছে। ইরফানকে নিয়ে এক

চরম আশঙ্কার কথা সবাই ভাবছিলাম। কিন্তু কেউ সাহস করে তা বলতে পারছিলাম না। তবে কি নানির কথাই সত্যি হল? আরো অনেক অল্প বয়সী কাশ্মীরি ছেলেদের মতো ইরফানও কোন ভুলভুলাইয়াতে ঢুকে পড়ল। এক দিকভ্রান্ত জিহাদী হয়ে গেল না তো? ওর পরিনতি কি হবে? আল্লা যেন ওকে রক্ষা করেন।
চাপা আশঙ্কার মধ্যে আমাদের দিন কাটছিল। এখন এখানে প্রায়ই Internet বন্ধ করে দেয়। সবার মনে ভয় না জানি কখন কি ঘটবে। Internet থাকলে আব্বুর সঙ্গে আমাদের প্রায় রোজ রাতেই কথা হত। সওকত চাচা রোজ সকালে দোকানে যাবার সময় মাকে জিজ্ঞাসা করেন কিছু লাগবে কি না। দরকারী জিনিষটি ফেরার সময় দিয়ে যান। বিকালবেলা মা Chamber থেকে ফিরে এলে চাচী এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করেন আর ইরফানের কথা বলে চোখের পানি ঝরান।

এর মধ্যে একদিন সকাল থেকেই ঝির ঝির করে বরফ পড়ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে weather আরো খারাপ হতে লাগল। সেদিন বেশ ঠান্ডা পড়েছিল।তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করে আমি আর মা Fireplace এর সামনে বসে গল্প করছিলাম। তখন হঠাৎ Load shedding হল।এই সময় মার mobile বেজে উঠতেই আমরা ভাবলাম আব্বুর phone। মা phone টা দেখে অবাক হয়ে বললো, "একি এত রাতে সওকত ভাইয়ার phone? কি ব্যাপার হলো?" ঘড়িতে তখন 12টা বেজে গেছে। চারিদিক অন্ধকার, শুনশান, নিস্তব্ধ। মা phone তুলে জিজ্ঞাসা করলো, "সওকত ভাইয়া, কি হয়েছে?" কিছুক্ষণ পরে বললো, "আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি।"
মা আমাকে বললো, "আমার mobile টা রাখ। আব্বু phone করলে বলবি সওকত চাচার বাড়িতে গেছি। ভাবীর খুব শরীর খারাপ। ভাবীকে দেখেই ফিরে আসছি।" এই বলে মা তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষে ভর্তি ডাক্তারী ব্যাগ আর কিছু দরকারী medicine ইত্যাদি ব্যাগে ভরে দরজা খুলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে গেল। আমি দরজা বন্ধ করতে যাবার সময় অন্ধকারের মধ্যেও দেখলাম আমাদের বাগানের শেষে Main Gate এর বাইরে রাস্তায় সওকত চাচা আর তার ঠিক পিছনে গা ঘেঁষে কালো পোষাক পড়া লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা ইরফান নয়, অন্য কেউ। ওরা পিছন ঘুরতেই মনে হল, লোকটার হাতে কি যেন চক্ চক্ করে উঠলো। চোখের বিভ্রম কিনা বুঝতে পারলাম না। বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে বসার ঘরের জানালায় চোখ রেখে মায়ের জন্য এক রাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরে তখন আবার বরফ পড়া শুরু হয়েছিল।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে সওকত চাচার ঘরের দরজাটা ফাঁক হয়ে একটু আবছা আলো বাইরে এল। মনে হল মা বেড়িয়ে এল, মার ঠিক পিছনে ছায়া মূর্তির মত লম্বা লোকটা আর মার পাশে সওকত চাচা। ওরা তিনজন অন্ধকারের মধ্যে গেটের দিকে এগিয়ে আসছিল। কেউ টর্চ জ্বালছিল না দেখে আমার খুব আশ্চর্য্য লাগছিল। হঠাৎ সেই সময় চারিদিক থেকে কতগুলি আলো জ্বলে উঠলো। সওকত চাচার বাড়িটা আলোতে ঝলমল করতে লাগল। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেলাম সওকত চাচার বাড়ির gate এর সামনে মা ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর মার ঠিক পিছনে কালো পোষাক আর মুখে কালো mask পড়া লম্বা লোকটা মার মাথায় একটা রিভলবার ঠেকিয়ে আছে।

আলোর পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে বললো, "Halt. Drop the Gun. Hands Up" তারপরেই মূহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল। দেখলাম সওকত চাচা ওই লোকটাকে জোরে ধাক্কা মারল। লোকটাও গুলি চালালো। সওকত চাচা আর মা দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।আর চারিদিক থেকে যেন ওই লোকটার উপরে গুলিবৃষ্টি হতে লাগল। সওকত চাচার ঘরের ভেতর থেকে আ....ব্বু বলে **ইরফানে**র গলায় আর্ত হাহাকার শুনতে পেলাম। আমি দরজা খুলে ছুটে বরফের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেড়োতে গেলাম। হঠাৎ আলোর পিছন থেকে একজন Army Officer এসে আমাকে ধমকে উঠলেন, " Get inside. Don't come out."
আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আমার মা।"
–Who is your Mother ?
আমি মায়ের পড়ে থাকা শরীরটার দিকে আঙ্গুল দেখালাম।
–Oh Sorry! The Terrorist has shot her. Let us see her condition.
এরপর দেখলাম কয়েকজন জওয়ান সন্তর্পণে সওকত চাচার ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। একটু পরে ইরফানকে ঘিরে ধরে নিয়ে ambulance এ তুললো। ইরফান ভাল করে হাঁটতে পারছিল না। তারপর মাকে ও stretcher এ করে আর একটা Ambulance এ তুলে নিল। আর একটা বড় Army Truck এ সওকত চাচা আর Terrorist এর Body তুলে নিয়ে চলে গেল। আর বেশ কিছু জওয়ান সওকত চাচার বাড়ি ঘিরে রাখলো।
আমি জানালার কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সওকত চাচার বাড়ির দিকে দেখছিলাম। শুধু ভাবছিলাম এ কি হলো? সওকত চাচা মাকে কেন বলেছিলেন যে চাচীর শরীর খারাপ। ইরফানের কথা কেন বলেন নি? Internet নেই। তাই আব্বুকেও কিছু জানাতে পারছিলাম না।
তখন দরজার bell বাজল। দরজা খুলে দেখলাম ওই Officer দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে পরিচয় দিলেন, "I 'm Major Raman of Indian Army।" জিজ্ঞাসা করলেন – বাড়িতে আর কে কে আছেন?

-আমি আর মা ছিলাম।
-তোমার মা এত রাত্রে ওখানে গেছিলেন কেন?
-মা ডাক্তার। চাচী অসুস্থ বলে সওকত চাচা phone করে মাকে ডেকে নিয়ে গেছিলেন।
-ইরফান একজন ভয়ঙ্কর terrorist। পাকিস্থানে ISI এর training নিয়ে এসেছে। আমাদের কাছে ওর নাম মীরহান। সাত দিন আগে এক encounter এ ও জখম হলেও পালিয়ে যেতে পারে। তারপর থেকে দুজন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমরা ওর বাড়িতে নজর রেখেছিলাম। আজ রাতে দুজনে লুকিয়ে এখানে এসেছিল। ইরফানের জখমের চিকিৎসা করাতে করাতে পারছিল না। সেইজন্য তোমার মাকে মিথ্যা বলে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেছিল। তবে তোমার মাকে ওরা ছাড়তো না। তোমাকে আটকে রেখে, ইরফান সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত্য তোমার মাকে বাধ্য করত পুলিশকে না জানিয়ে গোপনে ওর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে। তবে তোমার মাকে বাঁচাতে গিয়ে ইরফানের বাবা মারা গেলেন। তোমার মা ও seriously জখম হয়েছেন। আমরা তোমার মাকে nearest Hospital এ নিয়ে গেছি। আজই operation করতে হবে। Pray to God।
তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে একা থাকতে পারবে? এখানে তোমার কোনো relative থাকলে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে পারি।"
আমি বললাম "ওই বাড়িতে চাচী আছে। আমি চাচীর কাছে যাবো।"
Officer কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "ওই বাড়ির ভিতরে অনেক damage হয়েছে। ওখানে এখন searching হচ্ছে। তুমি ওখানে থাকতে পারবে না। তুমি বরং আমার সঙ্গে গিয়ে চাচীকে এখানে নিয়ে এসো। She is terribly shocked। তোমার আব্বু কোথায় আছেন? ওনার mobile number দাও। ওনাকে খবর দিতে হবে।"
আমি বললাম, "আমার আব্বুও একজন ডাক্তার। উনি London এ একটা seminar attend করতে গেছেন।"
ওনাকে আব্বুর mobile number দিলাম। তারপর ওনার সঙ্গে চাচীর বাড়ি গেলাম। গেটের কাছে বরফের উপরে তিন জায়গার রক্তের দাগ গড়িয়ে গিয়ে এক জায়গায় মিশেছে। সওকত চাচা, মা আর এক জঙ্গীর রক্ত এক জায়গায় মিলে গেছে।

ঘরের ভিতরে চাচী পাথরের মতো বসেছিল। শূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দেখলো। কোনো কথা বললো না। আমি চাচীর কাধে হাত রাখলাম। বললাম, "চাচী এখানে একা থাকবে কি করে? বাড়িতে আমিও একা আছি তুমি আমার কাছে চলো।"
চাচী বললো, "কিন্তু তোর চাচা আর ইরফান ফিরে এলে আমাকে ঘরে দেখতে পাবে না।"
আমি বললাম, "আমি তো একা থাকতে পারবো না। মা হাসপাতালে আছে। আমার ভয় করছে। চাচী, তুমি আমার সঙ্গে চলো।" চাচী আর কোনো কথা না বলে আমার সঙ্গে চলে এলো।
officer আমাকে বললেন, "আমি দুজন জওয়ানকে তোমাদের বাড়ির সামনে posting দিচ্ছি। কিছু দরকার হলে ওদের জানাবে। কাল তোমার মায়ের খবর জানিয়ে দেবো। "Take care of your Chachi. She has just lost her husband. You are a brave girl." এই বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।
আমি ভাবছিলাম একটু আগেও তো আমরা কেউ কাউকে জানতাম না। উনি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ভয়ঙ্কর জঙ্গীদের encounter করেন। মেরে ফেলতে হাত কাঁপে না। পরমূহুর্তেই আমার মতো অসহায় হয়ে পড়া অচেনা এক মেয়ে আর সদ্য স্বামীহারা এক ভয়ঙ্কর জঙ্গীর মায়ের জন্য এত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন।
সেদিন দুঃস্বপ্নের বাকি রাতটুকু আমি আর চাচী দুজনে দুজনের হাত ধরে Drawing Room এর সোফায় বসে নিদ্রাহীন কাটিয়েছিলাম। বাইরে বরফ পড়ছিল।
তারপর ভোর হলো। আর বরফ পড়ছিল না। পূব আকাশ রাঙা হয়ে সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। সওকত চাচার বাড়ির উঠোনের রক্তের দাগ বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছিল। হিংস্রতার সব চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে চারিদিক আলো ঝলমল করছিল। শুধু আমাদের দুজনের বুকের মধ্যে প্রিয়জনদের জন্য রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।
বেলা বাড়তেই প্রতিবেশীরা দেখা করতে এল। সবাই খুব আতঙ্কিত হয়েছিল। ইরফানের জিহাদী হয়ে যওয়া কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বেশ কিছু news channel এর reporter এল। আমি তাদের সঙ্গে অল্প কথা বলে বিদায় করলাম। আর সারাদিন মায়ের খবরের জন্য উৎকন্ঠিত হয়ে রইলাম। Mobile network নেই। কাউকে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। চাচী একটু স্বাভাবিক হয়েছিল। দুপুরে দুজনের জন্য নাস্তা বানিয়েছিল। মা আর ইরফানের কোনো খবর নেই। আরো একটা রাত দুশ্চিন্তায় কাটলো।
পরের দিন সকাল ন'টা নাগাদ হঠাৎ মার mobile টা বেজে উঠলো। কখন network এসে গেছে। ভাবলাম আব্বুর phone। দেখি অচেনা নম্বর। হ্যালো বলি।
ওপার থেকে উত্তর আসলো – Good morning. Major Raman Speaking. How are you?
আমি জিজ্ঞাসা করি,
-মা কেমন আছে ?
-তোমার মাকে গতকাল Air Ambulance এ Srinagar Military Hospital shift করতে হয়েছে। ওনার একটা বড়

operation করতে হয়েছে। It was successful. উনি আপাতত ICU তে observation এ আছেন। Don't worry, মা সুস্থ হয়ে যাবেন, তবে একটু সময় লাগবে।
−Thank you, Sir. মার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল। আপনি মায়ের এই mobile number টা কোথায় পেলেন?
− সওকতের পকেট থেকে পাওয়া mobile এ শেষ call টা এই নাম্বারে 'শবনম বহেন' বলে save করা ছিল।
উনি আবার খোঁজ করলেন, "বেটি, তোমার চাচী কেমন আছেন? ওনার জন্য খারাপ খবর রয়েছে। গতকাল Local Military Hospital এ ইরফান মারা গেছে। ওর সারা শরীরে গ্যাংগ্রীণ ছড়িয়ে পড়েছিল। High fever ছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেও ওকে বাঁচাতে পারলাম না। জঙ্গীর ছোঁড়া একটা বুলেট সওকতের মাথায় ঢুকলে উনি spot dead হন। আর একটা বুলেট তোমার মায়ের পিঠ দিয়ে ঢুকে rib এ আটকে ছিল। operation করে বুলেটটা বার করা গেছে। তবে সওকত জঙ্গীটাকে ধাক্কা না মারলে ঐ গুলিটাও তোমার মায়ের মাথায় লাগত। she is narrowly escaped for সওকত । God saved her. কিছু official formalities করে ওদের দুজনের body কাল ওদের বাড়িতে পাঠানো হবে। ওদের কোনো relative এর contact নম্বর থাকলে please তাদের খবর দিও। তোমার আব্বুকে সব খবর জানিয়ে দিয়ে ছিলাম। উনি আজ hospital এ তোমার মাকে দেখতে পৌঁছে গেছেন। Please take care of your Chachi. It is a disaster for Her. May god give her strength to tolerate the agony."
উনি phone টা কাটতেই আব্বুর phone এলো। আব্বু খুব tensed voice এ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঠিক আছ তো?"
আব্বুর গলা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম।
− মা কেমন আছে আব্বু?
−মা এখন stable আছে। তবে পুরো সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে আরো ক'দিন সময় লাগবে। চিন্তা কোরো না। আমি কাল সকালে Military Hospital থেকে সওকত ভাইয়া আর ইরফানের body নিয়ে ফিরবো। সব নিয়ম মেনে ওদের দাফন করাতে হবে। তুমি চাচীকে সামলে রেখো।
চাচী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কি খবর বেটি? আমার ইরফান আর ওর আব্বু কেমন আছে?"
আমি চাচীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "ওরা আর বেঁচে নেই চাচী। জঙ্গীর গুলি সওকত চাচার মাথায় ঢুকে গেছিল আর বিনা চিকিৎসায় ইরফানের জখম থেকে সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে ও কাল মারা গেছে।"

চাচী শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। চাচীর চোখের পানিতে আমার কামিজ ভিজে যাচ্ছিল। কাঁদতে কাঁদতে চাচী বলছিল, "আমি জানি, তোর চাচা এবার বেহেস্তে যাবে। কিন্তু আল্লাতো ইরফানকে ক্ষমা করবেন না। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ খুন করার পাপে ওকে তো দোখজের আগুনে জ্বলতে হবে। ওর জন্য একটু দোয়া করিস।" এই বলতে বলতে চাচী বুক ফাটা আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে মেঝেতে কার্পেট পেতে বললো, "আয় আজ আমরা দুজন ভুল পথে চলে যাওয়া ইরফানের জন্য আল্লার কাছে দোয়া করি। আল্লা যেন ওকে মাফ করেন।"
পরের দিন দুপুর ১২টা নাগাদ দুটো কফিনে সওকত চাচা আর ইরফানের body ওদের বাড়িতে এলো। আমি আর চাচী ওখানে অপেক্ষা করছিলাম। চাচীর চোখে নিঃশব্দ পানির ধারা। সওকত চাচার বুকে লুটিয়ে পড়ে প্রশ্ন করলো, "বলে দাও আমি একা কি করে থাকবো?"
তারপর ইরফানের কপালে চুমু খেয়ে সারা মুখে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলো। আর বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, "কেন এত ভুল করলি ইরফান? অন্য ধর্মের লোক কাফের হয় না। সবার গায়ে এক রক্ত। তোর বাবা হিন্দু ভাবীর জান বাঁচাতে গিয়ে মুসলমান জঙ্গীর গুলিতে নিজের জান কুরবান করলো। হিন্দু ভাবীকে তুই পছন্দ করতি না, আর সেই তো তোকে বাঁচানোর জন্য শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তোর চিকিৎসা করেছিলো। আর তুই ধর্মের বাহানায় মনে এত নফরত ভরে রেখেছিলি! ইসলামে তো ভালবাসার কথা বলা আছে।"
ইরফানের চাচা, মৌলভী আর আব্বুর তদারকীতে সওকত চাচা আর ইরফানের গোসল করানো হল, জানাজা পড়া হল। তারপর ওদের শরীর সাদা কাফনে ঢেকে দাফনের জন্য সবাই মিলে নিয়ে গেল কাছের গোরোস্থানে।
বাতাসে শুধু চাচীর হাহাকার ভাসতে থাকলো
–কেন এত ভুল করলি ইরফান ?
বাতাসে কান পাতলে আরো কত বুক খালি করে চলে যাওয়া দিকভ্রান্ত সন্তানের মায়েদের হাহাকার সমস্ত ভূস্বর্গ জুড়ে শুনতে পাওয়া যায়,
—"কেন ভুল পথে গেলি ? কেন এত ভুল করলি বেটা ?"

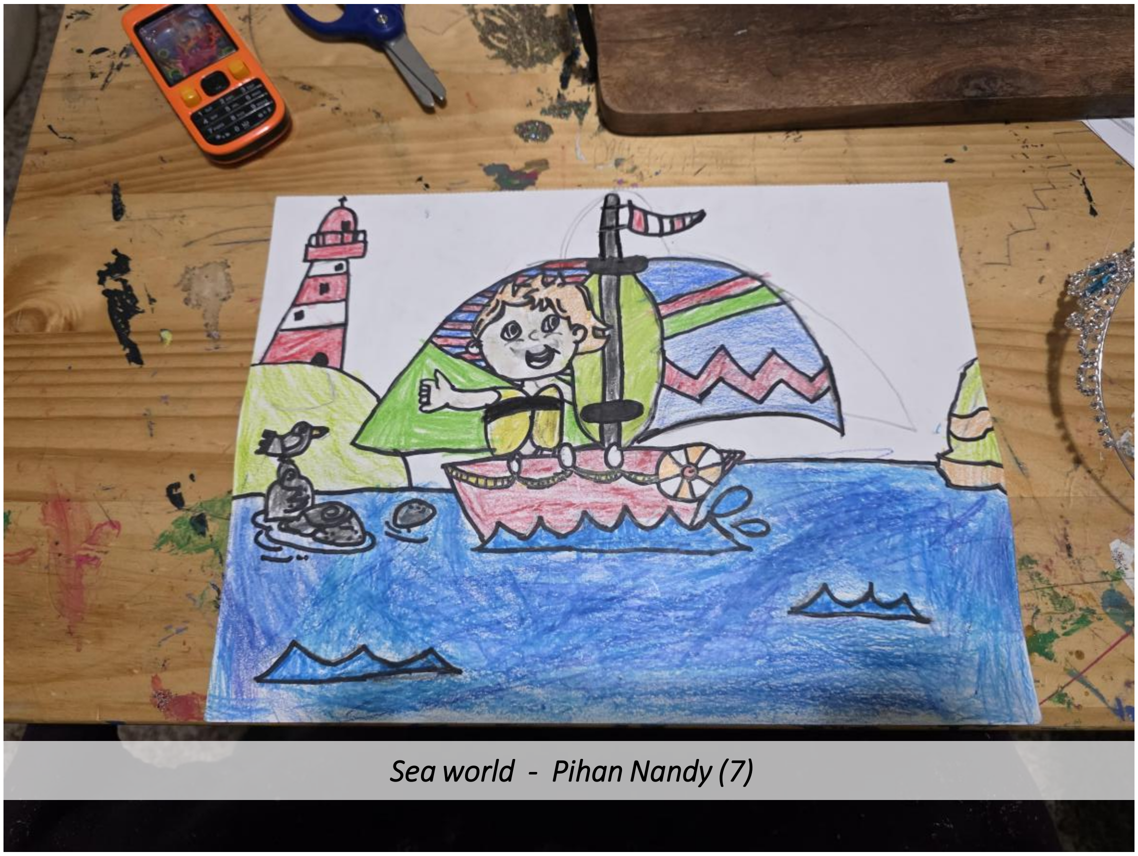

*Sea world - Pihan Nandy (7)*

# ঠাকুর তোমায় ছাড়ছি না

শ্রীপর্না ভট্টাচার্য্য

আমার জন্ম ও বেড়েওঠা উত্তরবঙ্গের একটি ছোট মফস্বল শহর কোচবিহার এ। যৌথ পরিবারে ঠাকুমা, ঠাকুরদা কাকা কাকী, ভাইবোনদের সাথে। আমার যখন ৪ বছর বয়েস, তখন আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা , আমি যাদের দাদু আর নাম্মা বলতাম, মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে আমাদের ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে তাদের দুজনের দুটো ছবি একসাথে বাধিয়ে রোজ ঠাকুর পুজোর সময় পুজো করা হতো। সেই ছোট বেলা থেকেই দেখতেম ঠাকুরদা ঠাকুরমার সেই ছবির সাথে আর একটি ছবিতেওঁ একসাথে ফুল দেয়া হয়। আমি জানতাম, তিনিও আমাদের ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের পরমাত্মীয়।
আমার বড়কাকুর একটা টেপ রেকর্ডার ছিল। কাকু আকাশবাণী শিলিগুড়ি তে গাইতেন, তাই গান প্র্যাকটিস করার জন্যেই ওটা কেনা। সেই রেকর্ডার এ সবার গলায় কিছু না কিছু রেকর্ড করে রাখা হতো। আমার প্রথম শেখা ও রেকর্ড করা কবিতা, অবশ্যই যা আমার মায়ের শেখানো, তা ছিল "ছোট্ট আমার মেয়ে"। লাল পার সাদা শাড়ী, দুহাতে, গলায় আর মাথায় সাদা কাগজের মালা পরে স্টেজ এ প্রথমবার যখন নাচ করতে উঠলাম, সেই গান ছিল "এদিন আজি কোন ঘরে গো"। হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রথম যে গান টি আমার মেজো পিসি আমাকে শেখেলেন, সেটি ছিল "ওরে গৃহবাসী"। সব প্রথম গুলোই ঠাকুরের, আজ ভাবতে ভালো লাগে, তখন এটাই খুব স্বাভাবিক ছিল।

সেই যে টেপ রেকর্ডার এর কথা বলছিলাম, ওতে একটা ভীষণ দামি জিনিস রেকর্ড করা ছিল। আমাদের বাড়িতে একবার বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী অশোক তরু বন্দোপাধ্যায় এসেছিলেন, তিনি ২ টো গান গেয়েছিলেন, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু ,আর জীবন যখন শুকায়ে যায়। পরে কতবার সেই রেকর্ডিং টা শুনেছি।
আমার বাবা তখন একটি গানের স্কুল এ রবীন্দ্রসংগীত শেখাতেন। আর বাড়িতেও প্রায় রোজ ই গান এর জলসা বসত। সেজো কাকা তবলা বাজাতেন, আর বাবা, পিসি গাইতেন। এই ভাবে কত রবীন্দ্রসংগীত যে শুনে ফেলেছিলাম। আমার আর আমার কাকাতো ভাই এর একটা খুব পছন্দের খেলা তখন ছিল গীতবিতান নিয়ে। চোখ বন্ধ করে যে কোনো ২টো পাতা খুলতে হবে, আর দেখে বলতে হবে সেখানে এমন কোনো গান আছে কিনা, যা আমরা কখনো শুনিনি। খুব কম সময়ে সেটা হতো।
পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলোতে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছিলাম ওই ভদ্রলোকের গান গেয়ে, তার গানে নেচে বা তার লেখা কবিতা আবৃত্তি করে।

যখন আমি তেরো কি চোদ্দ, সেই প্রথম বার সুযোগ পেলাম একটি নৃত্যনাট্যে, চিত্রাঙ্গদা, আমি সেখানে কুরূপা। তারপর কখনো শ্যামার বজ্রসেন, কখন চণ্ডালিকার মা, আবার কখনো মায়ার খেলার প্রমোদা। ঠাকুর তোমায় ছাড়ছি না।

বিয়ের পরে চলে গেলাম সুদূর নিউজিলান্ড। সেই বিদেশে আমার ছেলে জন্মাবার পর ভাবতাম, একে কিভাবে ঠাকুরের সাথে পরিচয় করবো? বেশ কঠিন কাজ। অনেক কষ্টে একটা কবিতা মুখস্ত করল, "প্রশ্ন", আর এক দুর্গাপুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেটা আবৃত্তি ও করলো। ব্যাস, তারপর আর পারিনা কিছু শেখাতে।
তারপর চলে এলাম USA তে। ছেলের যখন ৫ বছর বয়েস, আমার মা বাবা এলেন আমাদের কাছে। হঠাৎ ওর কি মনে হলো, আমার বাবা কাছে শিখলো একটি রবীন্দ্রসংগীত, "কতবার ভেবেছিনু". ভাবলাম যাকগে, একদম কিছু না জানার থেকে তো ভালো। ওমা! বাবা মা ফিরে গেলেন, ওর ও সংগীত চর্চা ফিনিশ। আশা প্রায় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু দেখলাম, ঠাকুর তার মতো করেই নিজের জায়গা নিজে করে নেন। গত বছর গরমের ছুটি তে দেশ এ গেলাম। আমার শাশুড়ি মায়ের বন্ধুদের একটা গ্রুপ রয়েছে, তারা আমার ছেলের কাছে গান শুনতে চাইলেন, ও অনেক গানের সাথে "কতবার ভেবেছিনু"-ও গাইলো। আর খুব এক্সাইটেড হয়ে ফিরে এসে জানালো, একজন দিদার ওর রবীন্দ্রসংগীত এতো ভালো লেগেছে, যে উনি ওনার নিজের কালেকশন এর সব স্বরলিপি ওকে দিয়ে দেবেন বলেছেন।

সেই সব স্বরলিপি এখন আমার বুকশেলফ এ শোভা পাচ্ছে।

# অরোরা বোরিয়ালিস

## মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

ভোর রাতে মিত্তির বাড়ীর সামনে যখন গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো, টিকলি ছাড়া আর কেউ প্রথমে টের পেলো না। টিকলি সারা রাত জেগে ওই সময়ে ঘুমোতে যায় বলেই দেখতে পেয়েছে গাড়ীটা থামল আর গাড়ী থেকে দু'জন নামল। তার একজনকে দেখে টিকলির দু'একটা হার্টবিট মিস হবার উপক্রম। উফ, এ যেন টিকলির মনের কল্পনা চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ঘুম হবে না বোধহয় তার।

টিকলির বাবার বন্ধু এই মিত্তির বাড়ীর এক ছেলে, এ বাড়ীতে বহু প্রজন্মের পুজো আজও খুব ঘটা করে হয়। প্রতিবারই টিকলির বাবা মা একদিন অন্ততঃ আসেন পুজো দেখতে। খুব ছোটতে টিকলিও এসেছে, টিকলি বড় হবার পর তার আসা হয়নি আর। বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে, ঠাকুর দেখেই পুজো কাটাত টিকলি। এবার টিকলি, বাবা মায়ের জোরাজুরিতে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। এবছরে মিত্তির বাড়ীর পুজোর অন্যতম আকর্ষন হলো, বহু বছর পর, এই প্রজন্মের ছেলের পুজোয় বাড়ী আসা। বিলেতে থাকা ছেলে বলে কথা, বাংলাদেশে মেয়ের অভাব নাকি? তাই মিত্তিররাও ফন্দি এঁটে তেমন সব বন্ধুদের বিশেষ নেমন্তন্ন পাঠিয়েছে যাদের ঘরে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। টিকলি, তেমনই একজন। টিকলি পুরোটা শুনে প্রচুর হাত পা ছুঁড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আসাটা ঠেকাতে পারেনি। আর এখন তো মনে হচ্ছে না আসলে কি ভুল করত। যদিও ওই আরেকটা মেয়ে কি যেন নাম সংযুক্তা না সম্পূর্ণা সে টিকলির কম্পিটিটর, মা বলেছে। কিন্তু তাতে কি? ওই মেয়েটা কেমন যেন অন্য জগতের মানুষ। ঠিক আছে, গাড়ি থেকে যে আরেকজন নামল কেমন কেমন টাইপ! ওই মেয়েটাকে বরং বলবে তাকে দেখতে। আহা, কি আনন্দ। সারা বাড়ী জেগে উঠেছে ছেলে ফেরার আনন্দে। শুধু টিকলি নিশ্চিন্তে ঘুম দিলো। লুকিয়ে একটা ছবি তুলেছে টিকলি, বন্ধুদের পাঠাতে গিয়েও delete করে। বরং ছেলেটার সাথে সেল্ফি তুলে পাঠাবে। ঘুমের মধ্যে কতো কিছু স্বপ্ন দেখছিল টিকলি, বেশ এগোচ্ছিল, মা এসে ঘুম ভাঙিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলো।
"কী হলো? ডাকছ কেন? ধুর ভাল্লাগে না"
"ভাল্লাগে না, মানে কী? পইপই করে বলেছিলাম এখানে এসে রাত জাগবি না। পুজোর বাড়ী, সকাল সকাল উঠতে হয়, চান সেরে কাজে লাগতে হয়"
"পুজো? হোয়াট পুজো? মা এখনও তো ঠাকুরের সামনের চাদরই খোলেনি"
"ওঠ ওঠ দেখ কতো রকম নিয়ম কানুন হয় পুজোর। শিখতেও তো হয়?"
"শিখে কী করব? তুমি তো বললে, এ বাড়ীর ছেলেকে বিয়ে করলে নাকি লন্ডনে থাকব। সেও তো নাকি কতো বছর পরে এলো পুজোয়"
"চুপ চুপ, দেয়ালেরও কান আছে, ওসব কথা এখানে আর না, এখন ওঠ। এই কাপড়জামা দিয়ে গেলাম, চান করে নীচে আয়"।

চান সেরে, নিজের পছন্দের কাপড়জামা পরে, পাঁচনগেলা মুখ করে নীচে নামে টিকলি। ঠাকুর দালানে না গিয়ে আগে খাবার ঘরে যায়। অনেকেই বেশ খাচ্ছে সেখানে। বেশ কটা লুচি, তরকারি, মিষ্টি খেয়ে তারপর ঠাকুরের উদ্দেশ্যে উঁকি মারে। চারদিক দিয়ে ঘেরা বাড়ীর মধ্যিখানে বিশাল উঠোন, তার একপাশে ঠাকুর দালান। উঠোনে দেখে কতো মহিলারা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাজ করছে, দু'একজন বয়স্ক পুরুষও কীসব দেখভাল করছে। কিন্তু মা বাবা কিম্বা আর যাকে দেখার ইচ্ছে টিকলির, কাউকেই দেখতে পেলো না। বরং সংযুক্তা না কি যেন নামের সেই মেয়েটা, কেমন সুন্দর একটা শাড়ী পরে, পিঠের ওপর ভেজা চুল ফেলে কাজেকম্মে লেগেছে। টিকলির কেমন জানি ওকে দেখে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেলো। কিছুতেই মনে করতে ইচ্ছে হলো না এ টিকলির কম্পিটিটর।
"হাই। কী করছ গো?" বলে ওর গা ঘেঁষে বসে উঁকি দেয় টিকলি। অদ্ভুত সুন্দর পুজোর ঘরের মতো গন্ধ মেয়েটার গায়ে। একটা মিষ্টি হাসি ফিরিয়ে দিলো সে টিকলির উদ্দেশ্যে।
"এই তো দেখো না, আজ তো মায়ের অঙ্গরাগ হবে..."
"হোয়াটস দ্যাট মিন?"
"মা আজ নতুন কাপড় পরবেন, গয়না পরবেন। বলতে পারো কাইন্ড অফ পুজোও হবে"
"কিন্তু এখনও তো কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া"
"হ্যাঁ গো, বাড়ীর মেয়ে এতদূর পথ এসেছেন, তাকে কটাদিন সবার থেকে আড়াল করে বিশ্রাম দেওয়া আরকি। তারপর, সুন্দর করে সাজিয়ে তবে সবাইকে দর্শন করতে দেওয়া হবে"
"অ্যাই অ্যাই, তুমি তুমি, সরে বোসো, সরে বোসো। চান করেছ? ছুঁয়ে দিলে নাকি ওকে? ইসস কি যে করো না তোমরা" মিত্র বাড়ীর বড় গিন্নির হাঁকডাকে চমকে ওঠে সকলে। পাশের বারান্দায় বসে থাকা মিত্র বাড়ী প্রবীণা

সদস্যা রাজলক্ষ্মী দেবী অবধি। চট করে উঠে দাঁড়ায় টিকলি।
"হ্যাঁ আন্টি আমি তো চান করেই এলাম, আর আমি তো জাস্ট ওয়াজ আস্কিং হার..."
"শোনো মেয়ে, আন্টি নয় কাকি, জ্যেঠি, মাসী, মামী যা খুশী ডাকতে পারো, অনেক মিষ্টি মিষ্টি ডাক আছে বাংলায় কেমন? আর পুজোগণ্ডার দিনে এই সব পোশাক না পরাই ভালো। শাড়ী পরা তোমার কম্মো নয় ও আমি বুঝে গেছি। কিন্তু চুড়িদার পরো, ঘাঘরা পরো। তাই বলে এই সব টিশার্ট মিশার্ট পোরো না। আর চান করেছ, খেয়েছ না? তোমায় যেন খাবার ঘর থেকে আসতে দেখলাম"
"হ্যাঁ ব্রেকফাস্ট..."
"এটুকুনও কি জানো না ঠাকুর পুজোর কাজ ওই খাওয়া কাপড়ে করতে নেই। শোনো, তোমারও যদি কাজ করতে ইচ্ছে হয় তাহলে আজ দেখো, কাল সকালে চান করে ধোওয়া কাপড় পরে, না খেয়ে, এসে কোরো, কেমন? যদি খুব অসুবিধে হয় চানের আগে খেয়ে নেবে। অ্যাই গঙ্গাজলটা নিয়ে আয় তো, ছিটো এখানে"
"না আন্... সরি, জ্যেঠাইমা, আয়েম ফাইন"
গুটিগুটি পায়ে সরে পড়ে টিকলি। নিজের বরাদ্দ ঘরটাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু, লক্ষ্য করে ওই ঠাকুমা হাতের ইশারায় তাকে কাছে ডাকছে। পাশটিতে মুখ কালো করে বসে, প্রচন্ড রাগ হচ্ছে টিকলির। কার ওপর রাগ করবে নিজেও বুঝতে পারে না।
"কী হলো দিদিভাই? রাগ হচ্ছে বুঝি?" রাজলক্ষ্মী দেবীর কথায় আরোও চোখে জল আসে টিকলির। মাথা নাড়ে সে।
"রাগ করিস না দিদিভাই, পুজোগণ্ডার দিনে কতোরকম ঘটনা ঘটে। তুই তো বাইরের লোক, এই আমাকে দেখ এ বাড়ীর তখনের একমাত্র ছেলের বউ হয়ে পুজোর কাজ কিচ্ছু জানতাম না। ওহ্ আমার শাশুড়ীমা কীইযে রাগ করতেন। এই আমার বড়বৌমার মতো। আমার তো খুব ছোট থাকতে বিয়ে হয়, আর বাবার বাড়ীতে পুজোটুজোর অত ধুম ছিল না। ঠাকুর ঘর ছিল, ঠাকুর মশাই পুজো করে দিতেন ব্যস। আমরা খেলে বেড়াতাম, নিজের নাম লেখা শিখতাম, কিন্তু পুজোর কাজ তখন শিখিনি" গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ মুছে, আরোও ঘেঁষে বসে টিকলি।
"তারপর? খুব বকা খেতে না?"
"খুউব। আসলে আমাদের বিয়েটা আমার শাশুড়ী মায়ের পছন্দ ছিলো না। আমার শ্বশুর মশাই আর তাঁর ছেলে, তাঁরা আমাদের বাড়ী, মানে আমার বাবার বাড়ী যেতেন। সেখানে তাঁরা আমায় দেখে পছন্দ করেন। তাঁদের ওপর রাগ করতে পারতেন না বলে আমার ওপর যতো রাগ দেখাতেন। এক বাড়ী লোকের সামনে ঠিক এমনি করেই ঝেড়ে কাপড় পরাতেন। আর কতো কীই বলতেন বাবাগো"
"মাই গড, তুমি হাসছ?"
"হাসব না? আমার তখনও হাসি পেতো, এখনও পায়। আসলে কি জানিস দিদি, যাঁরা পুজোর কাজ করেন, তাঁরা ভয়ে ভয়ে থাকেন। কোনো ভুলচুক হলেই তাঁরা দেবতার কোপে পড়বেন। এদিকে সব কাজ একা হাতে তো পারেন না করতে, তাই নিজের খামতি ঢাকতে অন্যকে বকেন"
"তুমি শিখে গেছিলে?"
"নাহ্ তেমন আর শিখলাম কই? পোয়াতী হলে পুজোর কাজ করতে নেই, এই খবরটা জেনে যেতেই আমি 'মা হবো মা হবো' করে পোয়াতী হয়ে গেলাম। ওই ওপরের বারান্দায় বসে দেখতাম"
"তুমি তো খুব দুষ্টু ছিলে। আচ্ছা, তারপরে?"
"খুব না? গল্প শুনতে পেয়ে বসে গেছিস। সব গল্প এখনই শুনবি? পুজো বাড়ী, যা যা ওই পুজোর সাজানো গোজানো দেখ গিয়ে যা"
"আবার যাবো? নো ওয়ে। গিয়ে কি করতে কী করবো আবার বকা খাবো। তারচেয়ে তোমার গল্প শুনি"
"এই তো গল্প। বড় খোকার বছর দুই বয়সে মেজ খোকা তার বছর দু'তিনের মধ্যে ছোট খোকা। তারপর বছর চারেক বাদে মেয়ে। চারটে বাচ্চা নিয়ে আমি একেবারে লেজে গোবরে হয়ে থাকতাম। তাদের নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো করতে করতে আমার নিজের নাওয়া খাওয়া মাথায়। তখন ঠাকুরঝিরা নিজেরাই আমায় অব্যহতি দিলো"
"ওয়েট ওয়েট হোয়াট ইস ঠা_ঠা_"
"ঠাকুরঝি? ওহ্ আমার বরের দিদিরা"
"অ্যান্ড হোয়াট ইস দ্যাট, কী জানি দিলো?"
"অব্যহতী? মানে ছেড়ে দিলো আমায়। আর কোনোদিন পুজোর কাজ করতে হবে না, এরকমটাই বলে দিলো। কিন্তু মুস্কিল হলো, তাঁদের প্রত্যেকের বয়স বাড়ল, আমার যখন বিয়ে হয় তখনই তারা দু'তিন বাচ্চার মা একেক জন। তখনই কতো বয়স সব। পরে তো তাঁরাও প্রতিবছর এসে পুজোর কাজ করতে পারে না। আমার শাশুড়ীমা দেহ রাখলো। মানে মারা গেলো আরকি। ততোদিনে আমার ছেলেরাও বেশ খানিকটা বড় হয়েছে। আমি তো এবাড়ীর কর্ত্রী, ফলে আমি নিদান দিলাম যে, আমার ছেলের বৌরা এলে, তারা যদি চায় বা পারে তখন আবার ধুমধাম করে পুজো হবে। এখন নমো নমো করে হোক। তা' যে ক'বছর ওইটুকু পুজো হয়েছে, সে ক'ছর আমিই করেছি পুজোর কাজ। ঠাকুর মশাই বলে বলে দিতেন, আমি করতাম। তারপর বড় খোকার বিয়ে হলো, বড়বৌমা এসে আবার পুজো চালু করল। এখন তো তখনের থেকেও বেশী জাঁকজমক হয় দেখি"
"তোমার গ্র্যান্ড চিল্ড্রেন ক'জন?"
"সেটা আবার কী?"
"নাতি নাতনি না কি জানি বলে"
"ওহো, তাই বল। সব এক এক। বড় খোকার একটা ছেলে। মেজ খোকার একটা মেয়ে, ছোট খোকার ওই যে ছোট্ট ছেলে আর মেয়ের এক ছেলে"

"আজ সকালে যে এলো তারা কে?"
"তুই কী করে জানলি? দেখছিস বুঝি?"
"ন্না, মানে, আমি তো রোজ ওই সময়ে ঘুমোতে যাই। গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে একটু দেখতে গেছিলাম। ঠিক দেখতে পাইনি"
"আমার বড় নাতি আর মেয়ের ঘরের নাতি। ওরা দু'জনেই এসেছে তখন"
"আমার না, ওই মেয়েটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে। সকাল থেকে না খেয়ে কেমন কাজ করে যাচ্ছে। আমরা কতো গল্প করে নিলাম, ও বেচারা দেখো, শুকনো মুখে অর্ডার ফলো করে যাচ্ছে"
"কার কথা বলছিস? বুল্লি?"
"বুল্লি? ওর নাম বুল্লি? মা যেন কী একটা শক্ত নাম বলল"
"সম্পৃক্তা। হ্যাঁ, বড় শক্তই নাম। ওকে বুল্লি বলেই ডাকি আমি"
"আচ্ছা, ঠাম্মু, তোমার কী মনেহচ্ছে না, ওই আন্টি না মানে ওই জ্যেঠি এই বুল্লি মেয়েটাকে প্রেফার করছে?"
"প্রেফার মানে?"
"কী ইয়ং লেডি কী চলছে, অ্যাঁ? কাজ কম্ম না করে শুধু আড্ডা মারা?"

প্রেফার মানে কী, সে উত্তরটা আর দেওয়া হলো না টিকলির। রাজলক্ষ্মী দেবীর নাতি এসে দাঁড়ায় হাসি মুখে। টিকলি, কথা বন্ধ, দম বন্ধ করে বসে থাকে। চোখটাকে যে ঠিক কোনদিকে পাঠাবে বুঝতে পারে না। বাড়ীর মানুষদের একসঙ্গে কথা বলতে দেওয়াই দস্তুর। কিন্তু, টিকলি তো নড়তেই পারছে না। ইস, ওই জ্যেঠি ঠিকই বলে, পুজোর দিনে এসব টিশার্ট কেপরি না পরাই উচিত। সামনে এসে যে দাঁড়ালো সেও কেমন পাজামা পাঞ্জাবী পরা। কিন্তু এবার টিকলির মনে অন্য প্রশ্ন, এইই কি সেই? লন্ডনে যে থাকে? নাকি এ অন্য কেউ? দু'জন ছিল যে? ঠাম্মুর সাথে হেসে হেসে মজা করে কতো কথা বলে চলেছে, টিকলির কানে কোনো কথাই যাচ্ছে না, শুধু নাতি ঠাকুমা দু'জনের হাসি দেখে চলেছে সে। এক সময়ে লক্ষ্য করল উল্টো দিক থেকেও তার দিকে কৌতুহল নিয়ে তাকাচ্ছে কেউ। নাহ্ আর না, উঠতে যায় টিকলি, খপ করে হাত ধরে ফেলেন রাজলক্ষ্মী দেবী।
"অ্যাই মেয়ে পালাচ্ছিস কেন? পরিচয় করে যা" বলে টিকলিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে থাকেন, "এই দুষ্টুটা আমার মেয়ে সুবর্ণার ছেলে, স্বপ্নীল। আর এ কে বলত?" নাতির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন রাজলক্ষ্মী। নাহ্ সে চিনতে পারে না টিকলিকে। তার মানে টিকলি যাকে পছন্দ করছে সে এ বাড়ীর সেই লন্ডনে থাকা ছেলে নয়। অন্ততঃ এটুকু জানা গেল। এরই মধ্যে দ্বিতীয় জনও হাজির। ভোর রাতে তাকে তেমন আকর্ষনীয় না লাগলেও এখন বেশ ভালোই লাগছে।
"আর, এই যে ইনি হলেন সৌম্যদীপ। আমার বড় ছেলে রত্নদীপের ছেলে" সে ও হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একটি মেয়ের সাথে পরিচয় করে একটু বোকা বনে গেছে।
"আরে ও টিকলি রে, সেই, 'গালফোলা টিকলি'। মেজকার বন্ধু যে, নিরঞ্জন কাকু তার মেয়ে। তুই ও তো চিনিস, মেজমামার বন্ধুকে। তোরা সব ছোট থাকতে খেলতিস এক সঙ্গে। টিকলি অবশ্য বহুকাল আসেনি এ বাড়ী। নে তোরা যা এবার, দেখ গিয়ে পুজোর দিকে। আমিও একটু ঘরে যাই, ধরত আমায়"।

সুযোগ পেয়ে বলতে গেলে দৌড়ে ঘরে যায় টিকলি, মায়ের রেখে যাওয়া চুড়িদারটা গলিয়ে নিতে হবে তার। কিন্তু প্রথমেই ঘরে এসে ধুপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চোখ বন্ধ করতেই দুটো কৌতুহলী চোখ ধরা দেয় আবার। চোখ খুলে একটু সময়ে দাঁত বের করে হাসে, আর মাথা চুলকে হিসেব কষে। নাহ্, কিছু একটা তার চোখে পড়েছে, সেটা যে কি সে ধরি ধরি করেও ধরতে পারছে না। আর এই এখানে আসার আগের থেকে শুরু হয়েছে 'গালফোলা টিকলি' শোনা। ধুর, উঠে চুড়িদার পরতে পরতে হঠাৎই বুঝতে পারে কি পড়েছে চোখে।
সে নাকি ছোটোতে আসত এবাড়ীতে, এদের সাথেই খেলত। তখন খুব ফুলো ফুলো গাল ছিলো বলে সবাই 'গালফোলা টিকলি' ডাকত। একবার খেলতে খেলতে কোথায় বুঝি পড়ে গিয়ে হাঁটুর নুন ছাল উঠে গেছিল। তখন সব বাচ্চাগুলো একসাথে বলে গলা খুলে কেঁদেছিলো। একফোঁটাও মনে নেই টিকলির, কিন্তু আসার পথে মা বাবার কাছে আর এসে ইস্তক এ বাড়ীর কাকীদের কাছে এরই মধ্যে কতোবার যে শুনে ফেললো।
হাতে কোনো কাজ নেই, গল্প করার লোক নেই, যে বাড়ীতে ছোটোবেলায় আসত, সে বাড়ীটাও মনে নেই বলে সময় কাটানো প্লাস একটু মনে করার চেষ্টায় এ বারান্দা সে বারান্দা ঘুরতে ঘুরতে ছাদে পৌঁছয়।
"রাগ করেছ? কী করব বলো? কাকী সমানে আমায় কাজে ডাকছেন, এতো বড় পুজোর কাজ বলে কথা"
"নাহ্, রাগ করে আর কী করব? তুমি ছাড়া আর তো কেউ নেই কাজ করার, করো গে যাও। তোমার কাজ ফেলে এলেই বা কেন? 'এতো বড় পুজোর কাজ' যখন, করো সেটাই। আমি এসেছি তাতে কী?"
"তুমি গিয়ে বলো না কাকীকে। আমারই কী খুব ভালো লাগছে? মানদা দিদি, স্বর্ণ দিদি, এমনকি কাকী তো ওই টিকলিকেও বকে সরিয়ে দিলেন, আমি কী করব?"
"বুঝেছি। মা তোমায় কেন কাজে আটকাচ্ছে"
"কেন?"

"মা তো আজও মেনে নিতে পারেনি না? মা নিজে তোমায় সিলেক্ট করলে কোনো ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু ছেলে সিলেক্ট করছে এটা কিছুতেই মানতে পারছে না। আর তাই তোমায় ঠাকুরের কাজে আটকাচ্ছে। যাতে তুমি কিছুতেই আমার ধারে কাছে না আসতে পারো। মা চায়, হয় টিকলি নাহলে পম নাহলে নিন্নি কাউকে একজনকে আমি সিলেক্ট করি। তাই, ওদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমি এতোদিন কেন বাড়ী আসিনি সেটাও বুঝল না? গ্রাজুয়েশনের পর মাস্টার্সের অজুহাতে তারপরে পিএচডি, চাকরি সব অজুহাত দিয়ে দিয়ে দেরী করলাম। দেখছি, মা কে সরাসরি বলতেই হবে।  তেমন হলে ঠাম্মুকে নাহলে বাবা, মেজকা, ছোটকা, পিসি সবাইকে দিয়ে বলাতে হবে। এখনও পুজোর আসল দিনগুলো তো পড়েই রয়েছে"।
ছাদ ফাঁকা দেখে নেমে আসতে গিয়ে নীচু গলায় কথার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়ায় টিকলি। খুব সন্তর্পনে উঁকি মেরে দেখে, সম্পৃক্তা আর সৌম্যদীপ দাঁড়ানো। এই তো তার হিসেব মিলতে শুরু করেছে। যখন ঠাম্মু ওদের পরিচয় করাচ্ছিল তখন স্বপ্নীল একদৃষ্টে চেয়েছিল তারই দিকে আর এই সৌম্য কেমন অপ্রস্তুত মুখ করে একবার দেখল তাকে ঠিকই কিন্তু ওর চোখ অন্য কাউকে খুঁজছিল। আর এই কারণেই ওই জ্যেঠিমা বুল্লিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু পমদিদি, নিন্নি তারাও সব টিকলির কম্পিটিটর? এটাতো নতুন খবর শুনলো সে।  পা টিপে টিপে কেটে পড়ে সেখান থেকে, কেউ দেখলে ভুল বুঝবে, ভাববে টিকলি আড়ি পাতছে বুঝি।
ওপরের বারান্দায় মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে নীচের ঠাকুর দালানে উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকে টিকলি। সেখানে ঠিক তখনই কেউ নেই। সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকা মেয়ের কেন যে মোবাইলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। সারা বাড়ীর বিভিন্ন ঘর থেকে হাসির আওয়াজ, কথার আওযাজ ভেসে আসছে। ছাদে দু'জন, বাকিরাও পুরো বাড়ীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আনন্দ করছে, এক টিকলিই যেন নিজেকে কোথাও ফিট করতে পারল না। ঠাম্মুর ঘরে যাবে নাকি ভাবে একবার। জ্যেঠিকে খুঁজল একটু, তাতেও মা কাকীমারা হাসে তাকে দেখে। পুজোর কাজ করতে চায় টিকলি, তাহলে বুল্লি ছুটি পাবে ভেবে। কিন্তু জ্যেঠি তখন বিশ্রামে আর সন্ধ্যেয় তেমন কোনো কাজের হেল্প লাগে না। যেটুকু কাজ সে জ্যেঠিমাই করে নেয় শুনলো টিকলি। ক্ষিধে ক্ষিধেও পাচ্ছে। নীচে একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখে টিকলি, সে বেচারাও কেমন একা একা বোকার মতো চারদিকে দেখছে। ওর কাছেই যাওয়া মনস্থির করল। চট করে নীচে নেমে গল্প জুড়ে দিল বাচ্চাটার সাথে। সে তার বাবা কাকার সাথে এ বাড়ী ঢাক বাজাতে এসেছে, মা মারা গেছে বলে বাবা গ্রামে রেখে আসেনি। বড়রা সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত তাই সে বেচারা একা। সোমেন নামের বাচ্চাটাকে টিকলি বোঝায় সেও ওর মতোই বড়দের সঙ্গে এসেছে বটে কিন্তু এখন একা। অনেকটা সময় কাটায় দু'জনে। দুপুরের খাবারও খাওয়ার ঘরে গিয়ে খায়। যে টিকলি নিজেই মাছ বাছতে পারে না, সে সোমেনকে সাহায্য করে মাছ বেছে খেতে। এখনও অবধি যে যার নিজের মতো খাবার ঘরে গিয়ে খাচ্ছে। পুজো শুরু হলে মানে মায়ের সামনের ঢাকা সরে গেলে তখন নাকি নিয়ম ধরে খাওয়া দাওয়া হবে। খাওয়ার পর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করতে বসে।

"অ্যাতো বড় বিসনা? কে ঘুমায় এখেনে? বিসনা এমন নরম হয়? এটা কি ভুলু? তোমার এটা?"
"হ্যাঁ রে, ও টেডি, আমার বন্ধু। অন্য সময়ের কথা তো জানি না রে, এখন আমাদের দিয়েছে এ ঘরে থাকতে। মা বাবা যদিও থাকছে না এঘরে"
"ক্যানো? তোমার একা ভয় করে না? আমার ভয় করে। মা মরে যাওয়ার পর থেকে রাতে খুব ভয় করে। আমি এখেনে শুই?" বলতে গেলে এক তরফা কথাগুলো বলে, হাত পা মেলে শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে নেয় সোমেন। টিকলি দেখে, চোখ বুজে ফেলেছে সোমেন। ওর জামাকাপড়ের হাল দেখে কষ্ট পায় টিকলি। সবাই যেখানে দারুণ পোশাকে ঘুরছে, সেখানে মা মরা এই বাচ্চাটা একটা মলিন জামা প্যান্ট পরা। হঠাৎই আইডিয়া পায় টিকলি। তার একটা বড় টেডিবিয়ার পুতুল সে সবখানে নিয়ে যায়। এখানে আসার আগে টেডিকে নতুন শার্ট প্যান্ট পরিয়ে এনেছে।
"টেডি, তোকে আবার নতুন কিনে দেবো রে, সরি বাবু। আপাততঃ আমার টি পরে থাক। এটা নতুন রে। তোর এই জামা প্যান্টগুলো সোমেনকে দেই? মনেহয় ওর হয়ে যাবে এগুলো"
ঢাকের আওয়াজ শুনে চমকে জেগে ওঠে টিকলি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামছে, আবার পুরো বাড়ী জেগে উঠেছে। নীচে ঢাক বাজছে। সোমেনকে তুলতে মন না চাইলেও ঠেলে তোলে। নিশ্চয়ই ওর বাড়ীর লোক ওকে খুঁজবে। চোখ মুখ জল দিয়ে ধুয়ে, নতুন জামা কাপড় পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়ে নীচে পাঠায় সোমেনকে। নিজের কাজে নিজেই অবাক হয় টিকলি, একটা ভাই পেয়ে কেমন বড় দিদি হয়ে গেলো নিমেষেই। দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে ঢাক বাজাচ্ছে স্বপ্নীল আর সৌম্যদীপ। সম্পৃক্তা শাড়ী বদলে একটা সুন্দর চুড়িদার পরেছে। সে ই মোবাইলে ভিডিও করছে বা লাইভে আছে। সবাই নীচের বারান্দায় আর মহিলারা একবার করে উলুধ্বনি দিচ্ছে আর বদলে যাচ্ছে ঢাকের বোল, বেড়ে যাচ্ছে ঢাকের স্পিড। জোরে লম্বা টানা শাঁখের আওয়াজ। আরেহ্, পমদিদি এসেছে। পমদিদির তো রেকর্ড আছে শাঁখ বাজানোর। তারমানে সৃজনদাদাও এসেছে? সে তো দারুণ ফটোগ্রাফার। পমদিদির বয়ফ্রেন্ড হলেও খুব বন্ধুত্ব তাদের মতো ছোটোদের সাথেও। আরেকপাশের বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখে তিলক আর  নিন্নিও এসেছে।  তিলক আর টিকলি নাকি মাত্র পাঁচ মিনিটের ছোটবড়। তাই নামও বাবারা একরকম রেখেছে। ছোটোর থেকে সবাই ওদের টুইনস বলে, দুই মায়ের কাছে জন্ম নেওয়া টুইনস। তার কাজিন নিন্নি সেও যথেষ্ট বন্ধু ওদের।

সোমেনও কেমন মিশে গেলো সবার সাথে, নীচে গিয়েই 'কাঁই নানা, কাঁই নানা' করে কাঁসর বাজাতে লেগেছে ঢাকের সাথে। বাড়ীর ছেলেদের দু'জনকে মাঝখানে রেখে বাকী ঢাকীরা সব কাঁধে ঢাক নিয়ে গোল করে নেচে নেচে বাজাতে লেগেছে।
চোখে জল আসছে টিকলির, সব্বাই উপস্থিত কিন্তু তার জন্য কেউ নেই। মা, বাবা, তিলক, নিন্নি, পমদিদি, সৃজনদাদা কেউ একবার ডাকল না, খুঁজল না । হঠাৎই নিজের পুরোনো স্বত্বা ফিরিয়ে আনে সে। ওপরের বারান্দা থেকেই ভিডিও করা শুরু করে। স্বপ্নীল যেন বার কয়েক তাকালো ওপরের বারান্দার দিকে? নাকি টিকলির মনের ভুল? চট করে ভিডিওটা পোস্ট করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায়। "এঞ্জয়িং বাড়ীর পুজো উইথ বাড়ীর লোকজন"। পোস্ট করার সাথে সাথেই প্রায় কমেন্ট আসতে শুরু করে। "কোথায় এটা?" "এখনই পুজো শুরু?" "ওয়াও" "এঞ্জয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। টিকলি ডুবে যায় ফোনে।
"অ্যাই মেয়ে, পুজোর দিনেও ফোনের মধ্যে কী রে? চল নীচে চল" চমকে তাকিয়ে দেখে টিকলি একজন গোলুমোলু মিষ্টি মতো মহিলা দাঁড়ানো। হ্যাঁ, এঁকে সবার সাথে দেখেছে বটে, কিন্তু ইনি কে জানে না টিকলি। তাকে কেউ ডাকছে, ভেবেই অবাক হয টিকলি।
"আয়াম ফাইন আন্টি"
"তুই না নিরঞ্জনদা'র মেয়ে? কি মিষ্টি হয়েছিস রে। মিষ্টি তুই ছোটোতেও ছিলি, তখন তো মিষ্টি গালফুলো বেবি ছিলি। এখন স্মার্ট লেডি। ফাইন আবার কী? একা একা পুজোর দিনে কেউ 'ফাইন' থাকে না, বুঝলি?"
"থ্যাঙ্কস আ লট। কিন্তু তুমি কে? তুমিও আমাকে চেনো?"
"আমি সুবু পিসি রে। সকালে যে ঠাম্মুর সাথে গল্প করছিলি, তার মেয়ে সুবর্ণা। ওই যে, ঢাক বাজাচ্ছে স্বপ্ন, ওর মা। তোর এখনও কি সুন্দর চুল রে, ছোটো বেলায়ও এমনই ছিলো। চল চল নীচে যাই"
মোটামুটি টানতে টানতে তাকে নীচে নিয়ে যায় সুবর্ণা। নীচে গিয়ে সুবর্ণাই যেন ঠেলে দেয় টিকলিকে সবার মধ্যে। সব কষ্ট ভুলেই গেলো টিকলি।

রাত প্রায় দেড়টা বাজে। সারা সন্ধ্যে কীইযে মজা করল সবাই মিলে। ঢাক বাজানোর পর, লাইটিং আপ সেশান হলো। সারা বাড়ীর আলো জ্বালানো হলো; টুনি লাইট দিয়ে ডেকোরেটর সাজিয়েছে। ঠাকুরের সামনের ঝাড় বাতী জ্বলল। সকালের ফুলের গয়না খুলে, মা কাকীমারা ঠাকুরকে সোনার গয়না পরালো।যদিও তারা সব পর্দার এ পার থেকেই দেখেছে। একমাত্র সৃজনদাদা ফটো তুলবে বলে মা কাকীমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলো। ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কিছু মিষ্টি সরবত দেওয়া হলো, আড়াল থেকেই। পরে টিকলি, বুল্লি, নিন্নি সবাই মিলে পরিবেশন করল সেই প্রসাদী মিষ্টি আর সরবত। সৃজনদাদার সাথে সবার পরিচয় করালো পমদিদি। পমদিদিও মাস্টার্সের পর একটা জব করছে আর পিএইচডির জন্য রেডি হচ্ছে। যদিও এক টিকলি ছাড়া আর কেউই, সৃজনদাদাকে দেখে জ্যেঠির শুকনো হাসি লক্ষ্য করল না। একটা সুযোগে, মা কাকীমাদের অনুরোধ করে তারা যেন এই কটাদিন পুজোর কাজ করে। ছোটরা শুধুই মজা করবে। জ্যেঠিমারও মন গলিয়ে, বুল্লির ছুটি আদায় করে নিলো টিকলি। পুজোর কটাদিন আর বুল্লি কাজ করবে না। রাতের খাওয়াও জম্পেশ হয়েছে, ছোটোরা সবাই মিলে রেস্তোঁরায় গেছিল। টিকলি মোবাইলে ঢুকে পড়েছে আবার। সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্টের উত্তর দিচ্ছে। নিজেদের ছবিগুলো দেখছে। কোনো কোনো গ্রুপফিতে দেখে স্বপ্নীল তার পাশে দাঁড়ানো, তার কাঁধে হাত রাখা। ইস, তখন খেয়াল করেনি তো টিকলি। ঘুম আসছে না। কুটকুট করে ছাদে পৌঁছয় টিকলি। ঘুমন্ত একটা বিশাল বাড়ী, কিন্তু আলো জ্বলছে প্রচুর, মনেহচ্ছে এক্ষুণি একটা কিছু ঘটবে, বাড়ী তারই অপেক্ষায়। ছাদ থেকে শহরের অনেকটা অংশ দেখা যায়। শহরও যেন ঘুমোতে পারেনি টিকলির মতোই। সব আলো জ্বালিয়ে কিছু একটা ঘটনার অপেক্ষায় রয়েছে।
"তাহলে, গালফোলা টিকলি, খবর কী? এখানে কেন, এতো রাত্রে?" চমকে তাকায় টিকলি। কখন যে নিঃশব্দে স্বপ্নীল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি সে। কী বলবে টিকলি? কথা তো চমকের চোটে বন্ধ; কিন্তু আবার সেই 'গালফোলা টিকলি'।
"কী? এখনও সেই? আগে সত্যিকারের গাল ফোলা ছিলি, আর এখন রাগ হলে গাল ফোলা" বলে হাসতে থাকে স্বপ্নীল।
"আর একবারও বলে দেখো"
"কী করবি রে? গালফোলা টিকলি?" আরোও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলে স্বপ্নীল। রেগে দুমদুম করে হাঁটা দেয় টিকলি। আর থাকবে না পুজো বাড়ীতে।
"অ্যাই, অ্যাই টিকলি, কোথায় যাচ্ছিস?"
"সরো সরো, সরো একদম। আমি বাড়ী যাবো। এখানে তোমরা সবাই খারাপ"
"সরি সরি সরি, এই দেখ কান ধরছি, আর গালফোলা টিকলি বলবো না, প্রমিস"
"আবার? আবার?" স্বপ্নীলের হাসির ফোয়ারা দেখে রেগে ওঠে টিকলি। কিন্তু কোথায় যেন একটা ভালোলাগা বুরবুরি কাটছে টিকলির।

"জানিস, তুই একদিন নীচের উঠোনে পড়ে গেছিলি, সেদিন..."
"ওহ নো, নট এগেইন। এবাড়ীতে আসার পর থেকে এই গল্পটা না হলেও হান্ড্রেড টাইমস শুনলাম। আমি পড়ে গেছিলাম আর তোমরা সবাই কেঁদেছিলে, রাইট? ডু য়ু হ্যাভ এনি থিং আদার টু টক অ্যাবাউট?"
"আছেই তো। এগুলো চিনিস দেখ তো?" দুটো মিষ্টি দেখতে বোতাম আর একটা ছোট্ট কাপড়ের বো স্বপ্নীল মেলে ধরে টিকলির সামনে।

"মাই গড, এগুলো তো আমার..."
"হ্যাঁ, তোর জামার। সেদিন তো তুই ওই জামাটাই পরেছিলি। কেমন করে জানি লাফাতে গিয়ে না কিভাবে তুই পড়ে গেলি। জামা থেকে এগুলো খুলে পড়েছিলো। সেই থেকে পকেটে নিয়ে ঘুরছি, দেখা হলেই ফেরত দেবো তোকে। কিন্তু তারপর তো আর তুই এলিই না। এবারে দেশে আসার আগে, মা যখন বলল তুই আসবি, তখন ভাবলাম হয়ত এটাই লাস্ট চান্স এগুলো ফেরত দেওয়ার" কথা সরে না টিকলির। হাতের মুঠোয় এভাবে ভালোবাসা যে ধরা যায় কোনোদিন জানতই না টিকলি।
"দেশে আসার আগে, মানে?"
"কানাডা থাকি রে এখন। পড়াশোনা করে আপাততঃ সেখানেই আটকে গেছি"
"কানাডা? ও মাই গড, দারুণ সুন্দর না? কোন সাইডে থাকো তুমি, তোমার ওখান থেকে নর্দার্ন লাইটস দেখা যায়?"
"খুব সুন্দর দেশ। এখনও তোর আগ্রহ আছে অরোরা বোরিয়ালিস দেখার?"
"অফকোর্স আছে। আহ্ ওই একটাই তো ড্রিম আমার"
"তোর মনে আছে টিকলি, দাদুর একটা বই নিয়ে আমরা পড়তাম? তোকে নর্দার্ন লাইটস এর সম্পর্কে পড়ে শোনানোর পর তুই বলেছিলি, 'আমায় দেখাবি অরোরা বোরিয়ালিস?' আমি বলেছিলাম, বড় হই নিয়ে যাবো। টিকলি এনাফ বড় হয়েছি না, বল? যাবি আমার সাথে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে?"
বাড়ীটা, শহরটা যেন এই মধুর মিলনের অপেক্ষাতেই ছিলো। দুর্গাপুজোর বাকি দিনগুলোয় শুধু অরোরা বোরিয়ালিসের আলোই ঘিরে রইল টিকলির চারপাশ।

*Incredible India – Rumku Chowdhury*

# গভীর রহস্য

## মালবিকা বসু

ক্রুজ জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাতে ছিল এক কাপ কফি । আপনমনে নীল সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম। বেশ লাগছিলো। সমুদ্রের নীল জল সূর্যের আলোয় চিকমিক করছিলো। জাহাজটাও ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তখন ছিল পড়ন্ত বিকেল। আকাশটা ছিল কিঞ্চিৎ মেঘলা। একটু পরেই সূর্যাস্ত হবে। সূর্যদেব মাঝে মাঝেই মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিলো।

সন্ধ্যে নামার পরে সমুদ্রের ঢেউ মাঝে মধ্যে জাহাজের গায়ে জোরে জোরে আছড়ে পড়ছিলো। মনে হচ্ছিলো এই বুঝি জাহাজটা উল্টে যাবে। জাহাজের মধ্যে থেকে লোকজনের হাসি-ঠাট্টা, হৈ হুল্লোড় কানে আসছিল। সমুদ্রের সাদা ফেনাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগছিলো ।
হঠাৎ করে কোথা থেকে ঘন কালো মেঘ এসে পুরো আকাশটাকে নিমেষের মধ্যে ঢেকে দিল। কালো মেঘের ভেতর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, মেঘের গর্জনও শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে কি এবার খুব বড় একটা ঝড় আসবে? একটু একটু ভয়ও করছিলো। উত্তাল ঢেউ এর জন্য জাহাজটা খুব জোরে জোরে দুলতে লাগলো।
মনে হচ্ছিলো এক্ষনি জাহাজের মধ্যে জল ঢুকে যাবে। আস্তে আস্তে জাহাজটা জলে ডুবে যাবে না তো ?
তাহলে তো আমরাও ডুবে যাবো!

এইরকম নানান উল্টোপাল্টা চিন্তা মনের মধ্যে তোলপাড় খাচ্ছিলো। ভাবতে ভাবতেই ঝড়ের গতি আরো বাড়তে শুরু করে দিলো। ঝড়ের দমকা হাওয়ায় বিশাল ক্রুজ জাহাজটা বারবার কেঁপে উঠছিল।
তখন জাহাজের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল আতঙ্কের চিৎকার। একটু পরে আরও জোরে দুলতে শুরু করলো। আমিও ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম। প্রতিটি ঢেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল, এবারই শেষ। ক্যাপ্টেনের কন্ঠ ভেসে আসছিলো মাইক্রোফোনে, "সবাই লাইফ জ্যাকেট নিন! শান্ত থাকুন!"
আমি তখন অসহায়ের মতো ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঠিক তখনই একটা বিশাল ঢেউ এসে জাহাজটাকে তছনছ করে দিল। বাসন পড়ার শব্দ, কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।
জাহাজটা একদিকে কাত হয়ে গেছিলো । হঠাৎ সব আলোগুলো নিভে গেল। আমি মরিয়া হয়ে দরজার একটা হাতল আঁকড়ে ধরেছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এক মুহূর্তেই ঢেউ আমাকে টেনে নিয়ে যাবে।
হঠাৎ দুম করে একটা শব্দ হলো। মনে হলো, জাহাজটা কোথাও একটা ধাক্কা খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজতে শুরু করল। সাইরেনের আওয়াজ শোনামাত্র আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।
চোখ খুলে দেখি আমি বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। তাহলে ওটা কি ছিল স্বপ্নের জাহাজ! চোখ খোলার পর খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু সেই ভয় তখনও কাটে নি। ঘামে শরীর ভিজে গেছিল। বুকটা খুব ধড়ফড় করছিল। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি, শান্ত একটা রাত, চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে ।
আমি বুঝলাম, -সবটাই ছিল এক দুঃস্বপ্ন । শুধু দুঃস্বপ্ন বললে ভুল হবে, উফ্, সেটা ছিল এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন! তারপর অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পর একটু ঘুম এলো। তারপর কখন যে সকাল হয়ে গেছিল, বুঝতে পারি নি।

সেদিন কেন যে এরকম স্বপ্ন দেখলাম, বুঝতে পারলাম না। জাহাজ, ঝড়, সবই স্বপ্নের ভয়াল কল্পনা। সারাদিন মনটা খুব অস্থির ছিল। এই স্বপ্ন দেখার পর অনেককিছু ভাবনা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিলো ।
আমার মনে হয়, গভীর সমুদ্রের তলায় যেমন অনেক রহস্য লুকিয়ে থাকে, সেরকম জীবনেও তো গভীরতা আছে, রহস্য আছে। আবার শান্তিও আছে, উত্তাল ঢেউও আছে।

মনোবিদরা বলেন - আমাদের অবচেতন মনকে ঘিরে অনেক রহস্য লুকিয়ে থাকে। অনেক স্মৃতি, ভয়, ইচ্ছে লুকোনো থাকে। ঘুমের মধ্যে মনের রহস্যময় দরজাগুলো খুলে যায়। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সেগুলো প্রকাশ পায়। অবচেতন মনের রহস্য জীবনের রহস্যের এক অংশ মাত্র। বোধ হয়, জীবনকে বোঝার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে আমাদের মনের অগোচরে।

জীবনের চলার পথ সবসময়ে তো মসৃণ হয় না । কখনো শান্ত সমুদ্রের মতো , কখনো হঠাৎ করে ঝড়, অস্থিরতা, কতরকম টানাপোড়েন আসে আমাদের জীবনে। সূর্যোদয় যেমন সমুদ্রকে আলোকিত করে, তেমনি সুখের মুহূর্তগুলো আমাদের জীবনকে আলোকিত করে । স্বপ্নটা না দেখলে হয়তো কোনোদিন এগুলো উপলব্ধি করতে পারতাম না।

জীবন এই সমুদ্রের মতো,
অসীম, অনন্ত, গভীর রহস্যে মোড়া ।
তরঙ্গের ভাঁজে লুকিয়ে থাকে-
হাসি আর বেদনার অচেনা দেশ ।

*I am the King - Ratula Sarkar*

*Ariel the Mermaid - Sharanya Chatterjee (6)*

*Unicorn - Sharanya Chatterjee (6)*

# তন্ত্র

## তুষ্কিক ঘোষ

এথিক্সের ক্লাসটা চলছে তো চলছেই। বিদিশা মন আর বসাতে পারছে না। ছটপট করছে। বারবার স্মার্টওয়াচটা দেখছে। এমজিএনরেগা এবং পিএম গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা যে আজ অবধি পৃথিবীর সবথেকে বড় সমাজকল্যাণ প্রকল্প, সেটা কানে ঢুকলেও মগজে ঠিকমতো গাঁথছে না।

বাবার আজকে দেড়লাখ পাঠানোর কথা। আগেই বিদিশা জানিয়েছিল বাবাকে। স্মার্টওয়াচে এখনো 'ক্রেডিটেড' দেখালো না। এডমিনিস্ট্রেশন জানিয়ে দিয়েছে আজ না পেমেন্ট হলে বিদিশাকে ওরা আর অপশানালের ক্লাস করতে দেবে না। বিদিশা, মণিপুরের সিএসের মেয়ে বলে কিছুদিন ছাড় পেয়েছিল, না মণিপুরের ইন্টারনেট সমস্যার জন্য, সেটা বিদিশা অবশ্য যেদিন এডমিনিস্ট্রেশনকে অনুরোধ করতে গিয়েছিল বোঝে নি। কারণ, অপূর্বর বাবা বিহার পিএসসির সিনিয়র অফিসার হলেও, ওকে পুরোটাই এডভ্যান্স করতে হয়েছিল। ভাগ্যিস অপূর্বর বাবা পিডবলুডিতে আছেন!

দেড়টায় ক্লাস শেষ হল। অপূর্ব কাছে এসে ভ্রূ তুলে জানতে চাইল কি হয়েছে। বিদিশার বাবার ওপর রাগ হচ্ছিল। চোখ ছলছল করে উঠল। জলটা চোখেই ধরে রাখতে গিয়ে গালদুটো লাল হল। বিদিশা একটা উৎকন্ঠার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"টাকা ঢুকে যাবে ইয়ার। নেক্সট ক্লাস তিনটেয়। তবতক লাইব্রেরী করে?" অপূর্ব ওর কাঁধে হাত রাখল। বিদিশা অপূর্বর হাতে গাল ঠেকালো। একফোঁটা জল পড়ল অপূর্ব হাতে। অপূর্ব বিদিশার গালটা মুছে বলল, "ধুর পাগলি"।

ক্যান্টিন থেকে কফি নিয়ে ওরা বেসমেন্টে নামল। সিঁড়িটা বড্ড সরু। পাশাপাশি যাওয়া যায় না। বেসমেন্টটায় আগে স্টোররুম ছিল। এখন স্টুডেন্ট বেড়ে যাওয়ায় লাইব্রেরী হয়েছে। লাইব্রেরীর দরজায় বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দুজনে এক-এক করে ঢুকল। ভিতরে আরো তিনজন মন দিয়ে নিজেদের ডেস্কটপে। বিদিশা নিজের ডেস্কটপে লগইন করে ক্যাটালগ দেখে র‍্যাক থেকে একটা সিভিক্সের বই এনে অস্থিরভাবে বইটার পাতা ওল্টাতে থাকল, আর ডেস্কটপে স্ক্রল করতে লাগল। খেমকাস্যার একবার বলেছিলেন, 'তামিলনাড়ুতে যেভাবে প্রশাসনিক কাজকর্মের ইমপ্লিমেন্টেশন হয় সেটা আইডিয়াল'। বিদিশা তামিলনাড়ু গভর্নমেন্টের কিছু মেমোরানডাম, রেফারেন্সের জন্য খুঁজছিল। অপূর্ব ততক্ষণে মেইন্সের পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাইটে ধ্যানমগ্ন। ছেলেটা খুব সিরিয়াস। আফটার অল বিহারি। ও বিহার পিএসসিতে অলরেডি কাজ করে। এখন লিয়েনে, স্টাডি লীভ নিয়েছে। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরল বিদিশার। বাবার ওপর অভিমানটা ফিরে এল।

অবশেষে, পিং হল স্মার্টওয়াচে। হাসি ফুটল বিদিশার মুখে। ডেস্ক থেকে উঠে অপূর্বর কাছে গিয়ে, অপূর্বর গালে গাল ছুঁইয়ে বলল, "ফিসটা দিয়েই আসছি!" অপূর্ব একটা নিঃশব্দ পাউট দিল। ভুবনমোহিনী হাসি অপূর্বকে উপহার দিয়ে বিদিশা আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরল।

এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসটা অ্যান্সিলারি বিল্ডিংয়ে। মেইন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তার উল্টোফুটে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। যথারীতি রাস্তায় এক-হাঁটু জল। অনেকদিনের না তোলা কাচড়া ভেসে বেড়াচ্ছে। কালো জলে ঢেউ তুলে গাড়ি যাচ্ছে। বিদিশার গা ঘিনঘিন করে উঠল। ড্রেইনগুলো কোনোদিন পরিষ্কার হয় না। প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট ফ্লোর বাড়াচ্ছে আর তাদের রাবিশ ড্রেইনগুলোকে ব্লক করছে। একটাই ভ্যাট পুরো এরিয়াতে, আজ অবধি একদিনও, করপোরেশনের ট্রাক এসে কাচড়া তুলে নিয়ে গেল না সময়মতো। রাস্তা জুড়ে কুকুর গরু, নোংরা করে রাখে। গজগজ করতে করতে বিদিশা হাঁটুজলে থপথপ করে অ্যান্সিলারি বিল্ডিংয়ে গেল। টাকা মিটিয়ে ফেরার সময় বাবাকে একটা ফোন করল। ফোন বেজেই গেল। মানে বাবা এখন ব্যস্ত। একটা 'থ্যাঙ্ক ইউ' টেক্সট করল বিদিশা।

হঠাৎ তিনটে বাইক অনেক স্পীডে গেল। বেসমেন্টের ভেন্টিলেটরটা, যেটা তাপ্পি মেরে বন্ধ করা ছিল লাইব্রেরীতে এসি চলবে বলে, বাইকগুলোর তোলা বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে গেল। হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগল বেসমেন্টে। অপূর্ব ওখানে যে! বিদিশা ওই হাঁটুজলেই দৌড়ালো।

রাস্তায় লোক জড়ো হচ্ছিল। ভাঙ্গা জায়গাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বেসমেন্ট নোংরা জলে ডুবে যাচ্ছে। জলপ্রপাতের

মতো জল ঢুকছে ওখানে। মেইন বিল্ডিং থেকে কয়েকজন এসে নামতে চাইল বেসমেন্ট। কিন্তু সিঁড়ি ততক্ষণে অর্ধেকেরও বেশি ডুবে গেছে। লাইব্রেরির দরজাও। দরজাটা বন্ধ। অপূর্ব ভেতরেই আছে। বিদিশা চিৎকার করতে লাগল। কোনো সাড়া এল না। দরজাও খুলল না। একজন একশোয় ফোন করতে থাকল। রং নম্বর, এনগেজ টোন শেষ করে অনেক পরে যখন অন্যপ্রান্তে কেউ ফোন ধরল, সে উত্তর দিল, "আমরা করোলবাগ থানায় জানাচ্ছি।" বিদিশা জ্ঞান হারালো।

দমকল দুঘন্টা পরে এসে পাম্প চালিয়ে জল বের করল। পুলিশ অপূর্বদের বডিগুলো লাইব্রেরির বন্ধ দরজার পিছনে পেল। ওরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দরজা খুলতে পারে নি।

কিছুদিন আন্দোলন চলল ছাত্রসুরক্ষা, দুর্নীতি নিয়ে। কেন ড্রেইন পরিষ্কার হয় নি, কেন চারতলা বাড়ি ছতলা হয়ে যাচ্ছে, কেন বেসমেন্টে পড়াশোনা করানো হচ্ছে এসব প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিদিশাও দুদিন রাস্তায় বসল। বিদিশার বাবা ইম্ফাল থেকে এসে ওকে নিয়ে গেলেন। "প্রোটেস্টে থাকলে আর ব্যুরোক্র্যাট হতে হবে না। আর ইউ নাট?"

ইম্ফালে বাবার বাঙ্গলোতেই সারাদিন থাকত বিদিশা। বাবা একা বেরোতে বারণ করে দিয়েছিলেন। ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিলেন বিদিশা বেরোতে চাইলে যেন সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে ফোন করা হয়। অগত্যা বিদিশার সারাদিনের কাজ হত বাবার লাইব্রেরীতে বসে টেবলল্যাম্প জ্বেলে বই পড়া, নিউজপেপারের এডিটোরিয়াল পড়া। অপূর্ব বলত, এডিটোরিয়ালগুলো পড়লে এসে লিখতে অনেক সুবিধে হয়।

প্রথম প্রথম চোখের সামনে যেন অপূর্ব ঘুরে বেড়াতো বাবার লাইব্রেরীর এক শেল্ফ থেকে অন্য শেল্ফে। এডিটরিয়াল পেজ থেকে কথা বলত। রাতে ঘুম থেকে উঠে বিদিশা দেখত, অপূর্ব ওর খাটের কোণে বসে। সিঙ্কের আয়নার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে অপূর্ব পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ভ্রু তুলত। প্রথম দিকে ভালই লাগত অপূর্বকে।

তারপর বিদিশা নিজেকেই ধমকালো। আস্তে আস্তে মনে জোর এনে একটা একটা করে গাঢ় রঙের পর্দাগুলো সরিয়ে জানলা খুলল। ঘরগুলোয় আলো বাতাস ঢুকল।

তারপর সময়ের সাথে ধীরে ধীরে অপূর্বও মিলিয়ে গেল। বিদিশা আরো বেশি করে বাবার লাইব্রেরীর বইগুলোতে মনোযোগ দিল। দুটো মাস কেটেও গেল ইম্ফালে।

"পাপা, আই মাস্ট রিটার্ন নাউ। সিলেবাস শেষ হবে না, নাহলে।" ডিনারের সময় একদিন বিদিশা বলল।

"ইউ সিওর?" বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন। "ভালো করে পড় বেটা। ইউ শুড বি অ্যান আইএফএস। আমাকে দেখ। পিষ রাহা হুঁ।"

"কিন্তু আমি ইন্ডিয়াতেই থাকতে চাই।" বিদিশা বলল।

"তাহলে আগমুটের জন্য প্রিপেয়ারেশন কর।" বাবা স্কচে চুমুক দিলেন।

বিদিশা জল খেল। "লেট মি ডু দ্য ডিশেস্ টুনাইট।" বিদিশা কথা ঘোরাতে চাইল। মা মারা যাবার পর থেকে বাবা বড্ড ইন্ট্রুসিভ হয়ে গেছেন। মা অসুস্থ থাকার সময় অনেকবার বাবা চেষ্টা করেছিলেন সেন্ট্রাল ডেপুটেশনের জন্য। যাতে দিল্লিতে থেকে মায়ের ট্রিটমেন্ট করানো যায়। স্টেট বাবাকে ছাড়ে নি। বাবার সেই থেকে আগমুট ইনক্লিনেশন। বিদিশা নিঃশব্দে খেতে থাকল।

বাবা কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে বিদিশার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গ্লাসটা একটু ঠোঁটে ঠেকিয়ে বিনয় আর সরিতাকে ডেকে ওদের আউট কোয়ার্টারে চলে যেতে বললেন। "কাল সকাল পাঁচটায় চলে এস। বিদি মেমসাব দিল্লি লওটেঙ্গে।"

কিচেন-সিঙ্কে ডিশগুলো রেখে ট্যাপ খুলল বিদিশা। তারপর কি মনে করে কিচেনের দরজা থেকে উঁকি মেরে একবার বাবাকে দেখল। ভদ্রলোক তখনো ডাইনিং টেবলেই বসে। স্কচের গ্লাস হাতে একটা ফাইলে চোখ বোলাচ্ছেন।

করোলবাগে ফিরল বিদিশা। কোচিং সেন্টারের লাইব্রেরীতে ঢুকল আবার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে। এখন লাইব্রেরীটা একতলায়। ক্যান্টিনের জায়গায়। বেসমেন্টটা আপাতত সীল করা। ক্যান্টিন চলে গেছে এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে। বিদিশা ডেস্কটপে লগইন করে ক্যাটালগ মিলিয়ে বুকশেল্ফ থেকে পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের একটা বই বের করল।

নিজের জায়গায় বসে, বইটার পাতা ওল্টাতে গিয়ে অপূর্বর কথা মনে পড়ল বিদিশার। অপূর্ব বলত, প্রশাসনিক সিস্টেমটা একটা ইলেকট্রিক সার্কিটের মতো। কারেন্ট চলতেই থাকবে এবং সেটাই উচিৎ। নাহলে গেজেটটাই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু রেসিসটেন্সও দরকার। নাহলে সার্কিটটা সুপার কন্ডাক্টর হয়ে যাবে।

*The Siren's Silence - Sreeja Dutta (12)*

*Rhythm of the Streets – Sreeja Dutta (12)*

# চতুর্ভুজ
## অমিয় বাসু

অরিন্দম সেন কিছুটা অন্যদের থেকে আলাদা ছিল। তার আত্মীয়রা যখন চকচকে ডেস্কের পেছনে, সাজানো গোছানো অফিসে কাজে ব্যস্ত, সে তখন প্রাচীন লিপির সঙ্গে লড়াই করত, ধূলোমাখা বইয়ের পাতা উল্টোত, হারিয়ে যেত বিস্মৃত ভাষার জগতে।

অরিন্দমকে প্রতিভাবান বলা চলে, তবে সে প্রশাসনের বদলে বেছে নিয়েছিল একাডেমিয়া। তার মন, ইতিহাস এবং জিনতত্ত্বের মধ্যেই ঘোরা ফেরা করত। সংস্কৃত আর স্টাটিস্টিকসের জাল বুনত। আঠাশ বছর বয়সের মধ্যেই, সে দুটো ডক্টরেট শেষ করেছিল; ঐতিহাসিক তত্ত্বে ও জিনোমিকসে। অরিন্দমের পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপগুলো তাকে একাডেমিক মহলে কিংবদন্তির পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তার অনেকদিন ধরেই তার গ্রামের বাড়িতে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল, ঠিক পালানোর জন্য নয়, বরং এক ইঙ্গিত বলা চলে। সুযোগও এসে গেল। তার ঠাকুরদার জন্ম শতবার্ষিকী খুব দূরে নয়। পরিবারের অন্য সদস্যের সঙ্গে কথা বলে যদি এক সভার আয়োজন করা যায়।

তাছাড়া অরিন্দম মিস করত আমের মুকুল, ফুল আর ফলের গন্ধ মাখানো বাতাস, সন্ধ্যার পর ঝিঁঝি পোকার ডাক, আর সেই আদিম নীরবতা, যা ঘিরে রাখতো তার আর এক পছন্দের জায়গা – পারিবারিক গ্রন্থাগার; যার বইয়ের তাকগুলো বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছে।

যাবার পরের দিন সকালে, এক কাপ চা হাতে, অরিন্দম ঘুরে বেড়াচ্ছিল পুরনো পড়ার ঘরে, যেটি তার প্রপিতামহ তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ-শাসিত সময়ে। সূর্যের আলোয় ধূলোর কণা ধীরগতিতে নক্ষত্রের মতো ভাসছিল। কোণের আলমারিগুলো যেন ডাকছিল, মায়াবী অর্থে নয়, বরং সেইসব বিস্মৃত জিনিসের মতো।
অরিন্দম একটা আলমারির পাল্লা খুলল। ভেতরে ছিল কয়েকটা পুরনো শাল, কিছু মরছে ধরা তালা, আর একটি ছবি যার কাঁচ সময়ের সঙ্গে ধুলোয় ঢাকা। ছবির পেছনে, সে হঠাৎ খুঁজে পেল তাদের পারিবারিক বংশতালিকা। চামড়ার মতো পুরু পার্চমেন্ট ধারগুলো সামান্য কুঁচকানো। শিরোনামে ছিল, "সেন বংশের পারিবারিক বৃক্ষ"। বিবর্ণ কালি, ক্যালিগ্রাফির ধরণে বাংলা অক্ষরে আঁকা।

সবচেয়ে নিচে তার নাম। এটার ডিজিটাল কপি করা উচিত, এই কথা ভেবে অরিন্দম খুব সাবধানে ব্যাকিং বোর্ড সরাতে গিয়ে একটা পাতলা ভাঁজ করা কাগজ মাটিতে পড়ল। দেখে মনে হল কাগজটা বংশতালিকার চেয়েও পুরনো, যেন মোমবাতির শিখায় পোড়া। কাগজটাতে অদ্ভুত সব চিহ্ন লেখা। সাংকেতিক চিহ্ন, ত্রিভুজ, অক্ষর, যা অরিন্দম একেবারেই চিনতে পারল না। ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে মিল থাকলেও, যেন একেবারে পরজীবী ভাষা। তবুও একধরনের কাঠামো ছিল– বারোটি দলের বিন্যাস, repeated সিম্বলস, আয়নায় প্রতিবিম্বিত অক্ষর বা mirrored letters বলা চলে। কিছু লিপি আংশিক ডিকোড করা ছিল সংস্কৃত ভাষায়, আর কিছু লেখা ছিল সংকেতের উপভাষায়, যেগুলো অরিন্দম পড়তে পারল না। "এটা কি কেউ দেখেনি? শুধুই পাণ্ডুলিপি না কোন বার্তা, যা শতাব্দী ধরে লুকিয়ে রাখা ছিল। আমারই অপেক্ষায়ে?" অরিন্দম এও বুঝতে শুরু করল – এটা শুধু cryptic symbolism নয়, অন্য কোনো রহস্যও লুকিয়ে আছে। ওর উত্তেজনা ক্রমশ উদ্বেগে পরিণত হল।

কলকাতায় ফিরে, অরিন্দম সেনের তার পূর্বপুরুষদের গন্ধমাখা ঘরগুলোর কথা বার বার মনে হতে লাগলো। পার্চমেন্ট, এখন তার ল্যাবের টেবিলে, নরম UV আলোয় উজ্জ্বল – যেন ভুল করে রাখা কোনো মধ্য যুগের স্ক্রোল।

প্রথমে, high resolution স্ক্যানার আর spectral imaging ব্যবহার করে পার্চমেন্টটা ডিজিটাইজ করল। ক্যালিগ্রাফির নিচে লুকানো চিহ্নগুলো স্পষ্ট হয়ে এল, যা খালি চোখে দেখা যায় না। কয়েকটা যেন বাঁকানো ত্রিশূলের মতো, অন্যান্যগুলি যেন এলোমেলো হয়ে যাওয়া musical নোট।
একের পর এক নিদর্শন ফুটে উঠল: আয়নার প্রতিবিম্বিত সংকেত, কয়েক লাইন অন্তর পুনরাবৃত্তি, যেন এক কাঠামোগত ছন্দ, কোন অলংকরণ নয়, বরং সূক্ষ্মভাবে সাজানো। সম্পূর্ণ না জানা অক্ষরগুলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠল – প্রথমে এক অস্পষ্ট ভাষা, তারপর সব অচেনা সংকেত ।
তার চামড়ার বাঁধাই করা নোটবুকে অরিন্দম সঙ্কেতগুলো আঁকতে শুরু করল। প্রতীকগুলোকে উল্টে দিল, আবার

সোজা করল। সেই সিকোয়েন্সগুলোতে গাণিতিক যুক্তিও খোঁজার চেষ্টা করল —প্রাইম সংখ্যা, ফিবোনাচ্চি সিকুয়েন্স, নাকি বৈদিক ছন্দের গণনা? আর একটা বিশেষ চিহ্ন বার বার লেখা রয়েছে।
সেই উপকথার অরিন্দমের ভালোই জানা। ছজন ব্রাহ্মণ আর ছজন ক্ষত্রিয় যারা কন্নৌজ থেকে এসেছিল। এটা কি একটা key হতে পারে, যা সংকেত আকারে লুকিয়ে রাখা হয়েছে! কিন্তু কেন?
অরিন্দম National Library-র এক পরিচিত librarian কে email করল — প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে ছয় পণ্ডিতকে বাংলায় নিয়ে আসার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। সেইসঙ্গে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির সাইবারনেটিক হিউম্যানিটিজ ল্যাবের সঙ্গেও যোগাযোগ করল, ওরা যদি সঙ্কেতগুলো decode করার ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারে! অরিন্দম জানত, সে কোথা থেকে শুরু করবে, বারানসী: অনন্ত নগরী, তথ্যের রক্ষক। তার পূর্ব পরিচিত বারানসীর ড. কিরীটি উপাধ্যায়কে ফোন করে বলল সে আসছে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিমানবন্দরে পা রাখতেই, অরিন্দম অনুভব করল, সে এখানে পর্যটক নয়। সে এসেছে এক প্রশ্ন নিয়ে। ট্যাক্সি এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে, অবশেষে Sampurnananda Sanskrit university-র দরজায় এসে থামল। এক কলোনিয়াল যুগের বালিপাথরের তৈরি, যার গম্বুজ দুশো বছরের স্মৃতির ছাপ বহন করে চলেছে।
ভিতরে, শতাব্দী-প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ঘুমিয়ে আছে, তালপাতার পাণ্ডুলিপির মধ্যে, যার রক্ষক কোনো লেজার বা অ্যালার্ম নয়, বরং ভক্তি ও শৃঙ্খলা। এখানেই দেখা হল ড. কিরিট উপাধ্যায়ের সঙ্গে। একজন কাঁচা-পাকা দাড়ির ইন্ডোলজিস্ট, যিনি তান্ত্রিক প্রতীকের উপর কাজের জন্য বিখ্যাত।

ড. উপাধ্যায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে অরিন্দমের বংশতালিকার কাগজটা পরীক্ষা করল। তারপর প্রতীকগুলির উপর তাঁর আঙুল চালিয়ে বলল "এটা কোনো সাধারণ লিপি নয়।"
দুজনে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটালো পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণাগার ঘরে।
— যেখানে বাতাসে ছিল নিম ও প্যাপিরাসের গন্ধ; ছাদে ঘুরছিল ধীর গতির ফ্যান। কিরীটি উপাধ্যায় হটাৎ উঠে গিয়ে কোনের এক আলমারী থেকে আর একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলেন — ১৬০০ সালের শেষের দিকের লেখা, নাম, "যন্ত্রগ্রন্থ: অভিবাসী লেখকদের রহস্য"।
সেই রাতে, 'বনারসী কচৌড়ির' আর 'ধহীবড়া' খেতে খেতে, তারা নিজেদেরই প্রশ্ন করলো, এসব কি এক নির্দেশিত সংকেত না অন্য কিছু? অরিন্দমের মতো একজন উত্তরাধিকারীর জন্যেই বা কেনই বা রাখা ছিল? ইউনিভার্সিটি-র গেস্ট হউসে ফিরে, রাত জেগে অরিন্দম সবকিছু লিখে রাখল। সে বুঝতে শুরু করল, তার আবিষ্কার শুধুই ঐতিহাসিক কৌতূহল নয়, এটা কয়েক শতাব্দী আগে রচিত হয়েছিল, যারা সময় সরল রেখা নয়, বরং একটি বৃত্ত বা লুপ।

কলকাতায় ফেরার আগে, ড. উপাধ্যায় তাকে একটি লাল রেশমে মোড়ানো স্ক্রোল দিলেন। বললেন "এটা অতি প্রাচীন গণিতগ্রন্থ এর অনুবাদ। এটা, যদি সম্ভব হয়, কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর হিরোশি তানাকাকে দেখিও। হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।"
অরিন্দম বারানসী ছাড়ল এক অদ্ভুত কিন্তু নিশ্চিত অনুভূতি নিয়ে। তার যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আগে থেকেই কল্পনা করা ছিল।

কিয়োটো, জাপান — একইসঙ্গে চিরকালীন এবং আধুনিক, যা এক ধরনের নীরব শ্রদ্ধা বহন করছে। বৌদ্ধ মন্দির ও শিন্টো উপাসনালয়, প্রাচীন ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রযুক্তির সঙ্গে হাতে হাত রেখে চলেছে। আঁকাবাঁকা গলি, গাঢ় কাঠের পুরনো বাড়িগুলো হাজার বছরের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রফেসর হিরোশি তানাকা এক বিশিষ্ট গবেষক, যিনি গত চল্লিশ বছর ধরে সংকেত বিদ্যা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তানাকার গবেষণাগার sterile research lab-এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাঁচা কাঠের ঘর, ধূপের মৃদু সুবাসে ভরা, একবারেই হাই-টেক যন্ত্রগুলোর বিপরীতধর্মী।
পিছনের দেওয়ালে একটা বড়, জটিল কালো রঙের মণ্ডল (সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ বৃত্ত বা চাকা) ঝুলছিল। কিন্তু তার গাঢ় concentric circles-র রেখাগুলো কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছিল, যা শুধু গবেষকদের চোখেই ধরা পড়বে। তানাকা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নিচের Zen বাগানের দিকে তাকিয়ে, যেন এক গভীরে ধ্যানে নিমগ্ন।

"প্রফেসর তানাকা, ড. কিরিট উপাধ্যায় আমাকে পাঠিয়েছেন।" অরিন্দমের গলায় উদ্বেগ মেশানো শ্রদ্ধা। "এই আমার কয়েকশো বছরের পুরোনো বংশপরিচয় আর কাগজে লেখা কিছু সংকেত। যেন এক ধাঁধার মধ্যে আরেক ধাঁধা — cryptic সিম্বল আর জ্যামিতি দিয়ে এনকোড করা। আমাকে যদি ডিকোড করতে সাহায্য করতে পারেন, তবে আমি খুবই উপকৃত হব।"

তানাকা ধীরে ধীরে ঘুরলেন। তিনি এমন একজন গবেষক, যিনি কম কথা বলেন। কিন্তু যখন বলেন, তাঁর প্রতিটি কথা দীর্ঘ গবেষণা বছরের আভাস দেয়। তানাকা অরিন্দমকে বসার ইঙ্গিত করলেন। অরিন্দম যত্ন সহকারে পার্চমেন্টটা খুলল।

তানাকা সূক্ষ্ম প্রতীকগুলো দেখে মৃদু স্বরে বললেন, "এটি... এটি একটি যন্ত্র, তাই না? তারপর একটু ভেবে বললেন, "শুধুই যন্ত্র নয় — এটা গোপন সংকেতের ইশারা।" অরিন্দমের উত্তেজনা বেড়েই চলল।
তানাকা ব্যাখ্যা করলেন, "এই ধরনের সংকেতের প্রাচীন স্মৃতিশক্তি সংরক্ষণের উপায় গ্রিসের অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত এই পদ্ধতি জানতেন।

তানাকা ডেস্কের উপর রাখা একটি বড় ড্রইং পেপারে একটি বৃত্ত আঁকলেন, তারপর সেটা চারটে চতুর্ভুজে ভাগ করলেন। তারপর বললেন "তোমার সংকেতটি এনকোডিং ভিত্তিক — এটা একটা নির্দেশিকা। তুমি যে cryptic symbol গুলো আবিষ্কার করেছ, সেগুলো শুধুই অক্ষর নয়, এক নির্দেশনা, যা এই চারটে জায়গার সমন্বয় করছে।
"এই নির্দেশিকটা কি দেখাচ্ছে?" অরিন্দম উদ্বেগ বেড়েই চলল। এটা একটা গোপন নির্দেশিকা, যা এক হারানো উত্তরাধিকার পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল।" তানাকার চোখ তখন আবিষ্কারের রোমাঞ্চে জ্বলজ্বল করছে।
"এটা এক বিশেষ স্থান নির্দেশ করছে — প্রাচীন শক্তির স্থান, যেখানে ছজন পণ্ডিত তাদের চিহ্ন রেখে গেছে। cryptic সিম্বলসগুলো সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।"

অরিন্দম ড. উপাধ্যায়ের দেওয়া স্ক্রোলের কথা প্রায় ভুলেই গিয়ে ছিল। ওটা তানাকাকে দেখাতে, উনি প্রায় চমকে উঠলেন। "এটা কোথায় পেলে?"
"ড. উপাধ্যায় আমাকে দিয়েছেন আপনাকে দেখবার জন্যে।"
"উপরে বাঁদিকে এই সিম্বলটা চিনতে পারছ নিশ্চয়!"
"হাঁ, আমার পারচমেন্টে এই সিম্বলইতো আছে।"
তানাকা বলে চললেন, "আমি তিব্বতী স্ক্রোলে এই রকম চিহ্ন দেখেছি। আমার মনে হয় এটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ক্রোল হতে পারে।"
"সে সবই ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।" তানাকার উত্তর, "পণ্ডিতেরা বা ছাত্রেরা পালবার সময়ে হয়তো কিছু স্ক্রোল আনতে পেরেছিল ।"
অরিন্দম বলে উঠল, "আমি আমার পূর্বপুরুষ বল্লাল সেনের লেখায় পড়েছি যে বল্লাল সেন বৌদ্ধ স্তুপ ভেঙে মন্দির করেছিল। বৌদ্ধ সন্যাসীরা তখন তিব্বতে পালাতে বাধ্য হয়।" তানাকা আর কোন কথা না বলে, জানালার কাছে গিয়ে দাড়াল। একটু পরে নিজের মনেই বলে উঠল, "ওই সংকেতের মধ্যেই ওই স্ক্রোলের location পাওয়া যাবে।"

তানাকার আর অরিন্দমের প্রায় একই সঙ্গে চোখে পড়ল, সংস্কৃত ভাষায় লেখা ২৫ ডিগ্রি উত্তর ও ৮৮ ডিগ্রি পূর্ব চারটে চতুর্ভূজ যেখানে মিশেছে। তানাকার প্রশ্ন করার আগেই অরিন্দম জানালো, ওটাই আরিন্দমের গ্রামের বাড়ির এলাকা।

কয়েক ঘন্টা পর, সে তানাকার অফিস থেকে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যার আলোয় চোখের পলক ফেলতেই বাইরের জগতটা আরও শান্ত অথচ দ্রুত মনে হল। তবে সেই নীরবতা এখন যেন আরও ভারী একটা অপেক্ষার মতো।
তার ব্যাগের ভাঁজে ছিল পার্চমেন্ট, ডিকোড করা location, আর বহু যুগ ধরে হারিয়ে যাওয়া নালন্দার অমূল্য স্ক্রোল। সবকিছুই একই জায়গার দিকে ইঙ্গিত করছিল — তার গ্রামের ভগ্নপ্রায় মন্দির।
অরিন্দম সেন বুঝল, তার জীবনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। এটা আর শুধু তার পরিবারের বিষয় নয়, বরং এক গভীর সংস্কৃতির অংশ, যা অনেক দিন ধরে উত্তরাধিকারীর অপেক্ষায় ছিল। আর সেই রহস্যের পরবর্তী চাবিটা লুকিয়ে আছে ওই শতাব্দী-প্রাচীন ভগ্নপ্রায় মন্দিরে।
অরিন্দম তার চেষ্টা আর ধৈর্য দিয়ে আরও একবার প্রমাণ করল যে, সমাজের আসল শক্তি তার ঐতিহ্যে — যা শুধু কথায় নয়, সংস্কৃতি ও মানবিকাতেও গভীরভাবে মিশে আছে।

rannaghor
RANNAGHOR LLC
RANNAGHOR LLC
DELIVERING MY PASSION TO
YOUR PLATTER
Call : 201-220-7648

"Customer Service the Way You Expect It!!"
CHILLY AIR
SERVICES
(512) 409-1599
HVA ES • SERVICE • INSTALLATION

# এঁচোড়ে পাকা

## সুদীপ সরকার

জগতে কত রকমের পাকা হয়ে জানেন? আমি এই বিষয়টা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাই। কারণ অনেক আছে। আমরা সব্বাই জানি ফল কাঁচা থেকে পাকা হয়। কিন্তু এইযে ফলটি পাকলো তার সাথে মানুষের কি সম্বন্ধ? এই যেমন ধরুন আম পাকলে আমরা বলি পাকা আম কিংবা জাম পাকলে বলি পাকা জাম। কিন্তু আমরা যেই বলি এঁচোড়ে পাকা সেখানেই মানুষ ঢুকে পড়ে। এই কিছু বছর আগেকার কথা, আমাদের পাড়ার ছেলে বাকু তখন ক্লাস টেনে পড়ে। ওর মামা মানে আমাদের ভানুমামা পড়ার টেবিলের ওপরে সিনেমার ম্যাগাজিন দেখে বলেছিলেন "তুই বড্ডো এঁচোড়ে পেকে গেছিস"। শুধুশুধু এঁচোড় কে দোষ দিয়ে কি লাভ? জানেন, আমাদের একসাথে দেখলেই ভানুমামা বলতেন "ওই যাচ্ছে এঁচোড়ে পাকার দল"। এই পাকা শব্দটির সামনে মাঝেমাঝে আরেকটি বিশেষ অবজেক্টিভ যোগ করে দিতেন সেটা আর আপনাদের নাই বা বললাম।
তবে তারপর থেকে প্রায় বাকুকে  আমরা এঁচোড়ে পাকা বলেই ডাকতাম। একদিন বাজারে গিয়ে দেখি বাকু সবজি কিনছে। সবজিওয়ালার পাশে একটি বিশাল এঁচোড় পড়ে ছিল। বাকুর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম "কি রে নিজেকে দেখছিস?" বাকু এক ঝটকায় আমার হাত সরিয়ে দিয়ে আরেকটু হলেই বিকৃত মুখ করে কাঁচা আম ছুঁড়ে মারছিলো। নেহাত ঠিক সেই সময় ভানু মামা এসে গিয়েছিলো বলে, মুখের আবর্জনা মুখেই গিলে ফেলতে হয়েছিল।

এই আমাদের ভানুমামা খুব মজার মানুষ, ওনার মজার গল্পের ভান্ডার অনেক। বয়েস ৬০এর কাছাকাছি। খুব my dear লোক। বাকু কলেজে ঢোকার পর থেকেই ওর পেছনে বেশি লাগেন। কাছে এসে বাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন
– বাকু বাবু কেমন আছেন? আপনাকে বাজার করতে দেখে আমি ধন্নি  হলাম। সূর্যদেব নিশ্চই আজ পশ্চিম থেকে উদয় হয়েছেন।
বাকু দেঁতো হাসি হেঁসে তাড়াতাড়ি সব্জির পয়সা দিয়ে কেটে পড়বার তাল করতেই ভানুমামা বলে উঠলেন
– আরে, যাচ্ছিস কোথায়। বলি মামার সাথে দুটো কথা বলে যা না। তা বলি কি, এই কিছু দিন আগে তোকে এক রমণীর সাথে ৪৭B বাসে দেখলাম যেন। বলি ওই বাসে করে বুঝি তেনাকে কলেজ ছাড়তে যাচ্ছিলি? মামা খেঁক খেঁক করে হেঁসে আবার শুরু করলো
– আর যাই বল তুই এখনো সত্তর দশকেই আটকে আছিস। তোরি হবে জানিস। তুই বেশ রোমান্টিক, বাসে প্রেম করা কিন্তু আলাদা লেভেল বাকুর কপালে একটু আধটু ঘাম দেখা দিলো। ভানুমামা কিন্তু তখনো নাছোড়বান্দা
– জানিস, সব সফল মানুষের পেছনে একজন মহিলা থাকে, তোর তো এখন থেকেই জুটে গেছে।
যতই হোক বাকু আমার প্রাণের বন্ধু ওকে শহীদ হবার থেকে বাঁচানোর জন্য আমিও ফুট কেটে দিলাম,
– মামা! প্রত্যেক সফল মানুষের পেছনে যদি একজন মহিলা থাকেন তাহলে যে মানুষটি সফল নন তাতে কিন্তু ওনার কোনো দোষ নেই, বরঞ্চ দোষটি ওই মহিলার। আপনি এইরকম মহিলা বিরোধী কথা বলতে পারলেন?
এই শুনে ভানুমামার মুখটা লাল হয়ে গেলো, চোখ রাঙিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন
– ঢেঁপমি বন্দ কর যত সব পাকা চালতার দল। বাড়ি আয়ে তোদের হচ্ছে।
এই বলে ভানুমামা বাজারের থলি দোলাতে দোলাতে শাহজাহান মাছওয়ালা দিকে এগিয়ে গেলেন।
তাও তো আমি বলিনি যে সফল হওয়ার এটাই যদি চাবিকাঠি হয় তাহলে যতদিন না সফল হচ্ছে পেছনে থাকা মহিলা বদলাতে থাকুন কোনো এক দিন তুক লেগে যাবেই।
ও হাঁ, ভালো কথা, আর একটি তথ্য আমরা আজ জানতে পারলাম যে আমাদের এঁচোড় থেকে চালতা তে পদোন্নতি হয়েছে। উফফ কি ব্যাপার ভাবুন তো, মানুষকে শাক সবজির শ্রেণীতে কি সুন্দর ভাবে বসিয়ে দিতে পারে ভানুমামা।
যাই হোক বাকুর দিকে তাকিয়ে বললাম
– দেখ তোর মতো আমিও সবজির category তে পড়ে গেলাম, তুই এঁচোড় আর আমি চালতা।
বাকু বললে
– তোকে জানোয়ারের ক্যাটাগরি তে ফেলেননি এটাই কত বড়ো কথা। তোকে পাঁঠাও তো বলতে পারতেন মামা।
– এইতো! তুই পাঁঠার category থেকে বেরোতে পারলি না, ওই গাছ পাঁঠাই হয়ে থাকবি।
আমরা বাজারের বাইরে বিহারি চাওলার দোকানে চা খাচ্ছি দেখি ভানুমামা আবার আসছে।  মুখে একটু বিরক্তির ছাপ।
জিজ্ঞেস করলাম
– কি হলো? মাছ পেলে? কি পেলে? কত করে পেলে?
– এই, তোরা এতো প্রশ্ন করিস কেন? বলি, এতো জেনে তোর কি হবে। জন্ম ইস্তক প্রশ্ন।

- যাহঃ বাবা! এই ছোট্ট প্রশ্ন করতে পারব না?
- দেখলি তো আবার প্রশ্ন।
- জানিস, বাচ্চা জন্ম নেবার পর দশ বছর অব্দি প্রশ্ন শুনতে হয়,
- বয়স কত?
    - দশ থেকে কুড়ি অব্দি শুনতে হয়, মার্ক্স কত?
    - ২০ থেকে ৩০ মধ্যে শুনতে হয়, মাইনে কত?
    - ৩০ থেকে চল্লিশ মধ্যে শুনতে হয়ে, বাচ্চা কত?
    - বাচ্চা কটা, বাকু ফুট কাটলো
- চুপ কর বলে মামা আবার শুরু করলে
    - ৪০ থেকে ৫০, সেভিংস কত?
    - ৫০ থেকে ৬০, পেনশন কত ?
    - ৬০ থেকে ৭০, সুগার কত?
    - ৭০ থেকে ৮০, আর কত ?

- জানিস, এই প্রশ্নের ঠেলায় জীবন শেষ হয়ে যায়। তার ওপরে মাছের যা দাম। নাহঃ আমি ঠিক করেছি এবার থেকে বাংলদেশী ইলিশ খাবই না। বেটাদের বড্ডো বাড় বেড়েছে। আমাদের নদীর ইলিশেরও তো একেবারে same টেস্ট।
- নাও চা খাও, মাথা ঠান্ডা করো। আর আমাদের সঙ্গে গুফতাগু করো। বাকু একটু ইচ্ছে করে উর্দু ঝাড়বার চেষ্টা করলো।
- দেখ তোর মতো মার্কা মারা বাঙালির মুখে উর্দু সয় না। কি বলতে চাইবি আর কি বেরিয়ে যাবে। বাংলাতেই বল বরং। ভানুমামা বলে উঠলো
- এই দেখনা আমার জানাশোনা একজন উর্দুতে তুম সালামত রাহো বলতে গিয়ে তুম সালা মত রাহো বলে বসেছিল। বুঝলি যার পেটে যা সয় সেটাই করা উচিত।
মামা হাতের লেড়ে বিসকুট চায় চুবিয়ে তলঙ্কাত মুখে চালান করে বললে,
- নাহঃ! মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেব, ডাল ভাত, আলু পটল খেয়ে বেঁচে থাকবো। ছাতে পটোলের চাষ করবো, একেবারে অর্গানিক mode .

বাকু বললে,
- ঐটি করলে কপালে দুঃখ আছে, কোনো এক দিন মামী কে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে মামী বলতেই পারে,
- তোর মামা ওপরে পটল তুলতে গেছে।
মামা প্রথমে বিষম খেলো তারপর এক চুমুকে চা শেষ করে বাকুর দিকে কটকট করে তাকিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।
ব্যাপারটি বুঝলেন তো? পটোলের কি মহিমা ভাবুন, নামটা ভুল ভাবে নিলেই মনে হবে দেহ ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করেছে।

তবে জানেন পটল কে খালি মরণের চোখে দেখলে চলবে না, পটলে জীবনও লুকিয়ে আছে। বললে হবে! এই যেমন ধরুন আগেকার কালে নায়িকাদের বলা হতো, "আহা কি পটল চেরা চোখ "
আমার মনে হয়ে ইমোশনাল ওভারল্পো হতে বেশ কয়েক জন নিজের ছেলের নাম পটল রেখেছে। তবে বেশি ভাগ সময় ওদের পটলা বলেই ডাকা হয়।
নঃ! আজ এর বেশি শাক সবজি নিয়ে বলবো না। তবে যাবার আগে এটা না বলে যেতে পারছি না। একবার Whatsapp এ একটি ভিডিও দেখলাম যেখানে একজন ব্যাংকার ম্যানেজার নিজের সজকর্মীদের ভিডিও কল এ প্রচুর গালমন্দ করছে। যেটা আমাদের চোখে পড়লো যে উনি কয়েকজনকে ঢেঁড়শ আর বাঁধাকপির গাঁট ও বললেন। আমি কিন্তু নিশ্চিত মিটিং শেষ হবার পর সহকর্মীরা প্রাণ খুলে হেঁসেছিলো।
ব্যাস! আর নয়, আমার কথাটি ফুরোলো নোটে গাছটি মুড়োলো।

অসুর পুজো
অয়ন গুহ
মুক্তরাষ্ট্রের দুর্দান্ত প্রতাপ মহারাজ দুলাল তরাম..
সকালবেলা আয়নার সামনে চুল আঁচরাছেন - ভেসে এলো - ঢাকের আওয়াজ..
দাম দাদাম দাম
মন্ত্রী !!
সকালে চান করে, আমি ঢাকি টাক - আমাকে ব্যাঙ্গ করে এক খানি ঢাক ?
বাজছে ঢাক, বাজছে কাঁসর, আজ দুর্গাপুজো খুব জমেছে আসর !!
আমার রাজ্যে, পূজিতো আমি দুর্গাকে নিয়ে - একি ছ্যাবলামি ?
এক ঘণ্টা পর..
থামো !!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ
পুরুষ নারীর পদতলে-
দেশ কি গেলো
রসাতলে ?
এখন থেকে সমন জারি
পূজিতো হবে না কোনো নারী -
থামাও বাদ্য,থামাও সুর,
"Daddy is back" - এসেছে অসুর
এদিকে পাতালে বিষণ্ণ মহিষাসুর
মহারাজ !!
মর্ত্য থেকে
দূত এসেছে
দেবী দুর্গা
Heavy ফেঁসেছে
দুর্গা গেলো, অসুর এলো - এবার সবাই মর্ত্যে চলো..
দাড়া, দাড়া, করি একটা লিস্টি,
মর্ত্যে গিয়ে কি
খাবো ?
বিরিয়ানি না
মিষ্টি ?

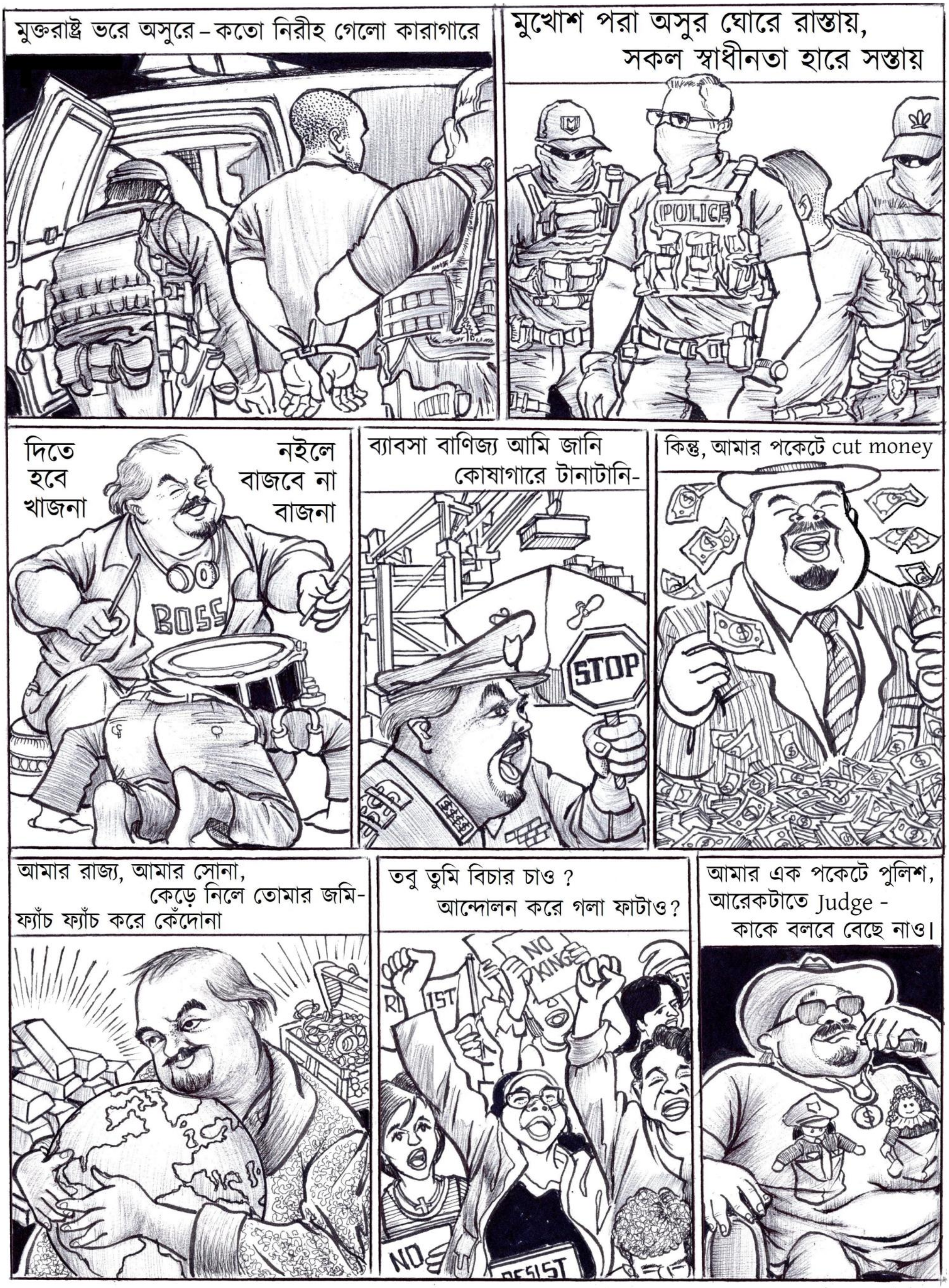
মুক্তরাষ্ট্র ভরে অসুরে – কতো নিরীহ গেলো কারাগারে
মুখোশ পরা অসুর ঘোরে রাস্তায়,
সকল স্বাধীনতা হারে সস্তায়
POLICE
দিতে হবে খাজনা
নইলে বাজবে না বাজনা
BOSS
ব্যাবসা বাণিজ্য আমি জানি
কোষাগারে টানাটানি-
STOP
কিন্তু, আমার পকেটে cut money
আমার রাজ্য, আমার সোনা,
কেড়ে নিলে তোমার জমি-
ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কেঁদোনা
তবু তুমি বিচার চাও ?
আন্দোলন করে গলা ফাটাও?
NO KINGS
আমার এক পকেটে পুলিশ,
আরেকটাতে Judge -
কাকে বলবে বেছে নাও।

এক বছর পর....
চাকরি নেই গত ছয় মাস, দুঃখের নেই কোনো ভাষা, নিত্য সঙ্গী শুধু ভয় -আর হতাশা!
PAYMENT DUE
মা, এইবছর আমরা দুর্গাপুজো করবো না ?
চুপ কর! চুপ কর! কেউ শুনলে হবে বিপদ!
মহাষষ্ঠির সকালে..
আয়, তোকে দুর্গা সাজাই
আমাদের খুব কষ্ট তুমি এবছর আসবে না?
RRRING..
অনেক দুর থেকে আসছি একটু জল দেবে ?
তুমি এসেছো !!!
সমাপ্ত

# লেগেসি

## সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ তিনদিন ধরে টানা ঝড়-বৃষ্টি হয়েই চলেছে। সূর্য্যের মুখ একবারও দেখতে পাওয়া যায় নি। পশ্চিমের জানালা অল্প খুলে রেখে আনমনা হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে সমরেশ। ঝড়ের দাপটে মাঝে মধ্যেই তাল, নারকেল গাছগুলো নুয়ে পড়ছে। মানুষজনের বাইরে বের হওয়ার কোন উপায় ছিল না দিনভর। সন্ধ্যা সমাগত। সারাদিন কেবল নিজের ঘর আর লাগোয়া অফিসে বন্দি হয়ে থাকা ছাড়া কোন গতি নেই।

গঙ্গা-পারের এক ব্লকের বি.ডি.ও সমরেশ। শহুরে ছেলে। বছর তিনেক হ'ল WBCS পাশ করেছে । ট্রেনিং-এর সমাপ্তির পর এটাই প্রথম পোষ্টিং। এক বছরের মত হল এখানে কাজ করা। পরিচিতি হয়েছে কিছু মানুষজনের সাথে। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে লোকাল থানার স্ বড়বাবুর সাথে। বয়সে কিছু বড় হলেও সমরেশকে যথেষ্ঠ সম্মানের সাথে কথা বলেন মজাদার মানুষটি। সময় না কাটলে সন্ধ্যার পর কখন- সখনও থানায় গিয়ে বসে। বড়বাবুর সাথে বেশ গল্প-গুজব চলে মুড়ি-চপ সহযোগে।

সরকারি আদেশে অফিস ছেড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। জায়গায় জায়গায় ত্রাণ পৌঁছাতে হচ্ছে ঝড়- জল উপেক্ষা করে। অফিসের সব কর্মী দিন-রাত এক করে মানুষের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হচ্ছে ত্রাণ নিয়ে। এদিকে গঙ্গা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। জলস্তর এখন বিপদ সীমার একদম কাছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ না হলেও চিন্তাজনক। রাজনৈতিক নেতাদেরও তৎপরতা তুঙ্গে।

ঘরে আঁধার ঘনিয়ে এল। ল্যাম্প জ্বালতে আলস্য লাগছে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য বিদ্যুতের সংযোগ এখন বিচ্ছিন্ন করা রয়েছে।

হাতে একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢোকে গোপাল - দীর্ঘদিনের কর্মরত হোমগার্ড কর্মী।
“শুয়ে শুয়ে থাকলেই চলবে এভাবে? গায়ে- গতরে ব্যথা হবে যে !“ কিঞ্চিত ধমকের সুরেই বলে উঠে।
সাহেবদের দেখভালের গুরু দায় যে তার।

কতজন সাহেব যে পার হয়ে গেলেন গোপালের হাতে তার কোন হিসাব নেই। একটা বিষয় বেশ নজর কেরেছে সমরেশের। সেটা হল , গোপালের মুখ থেকে থেকে, তাঁদের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা ছাড়া, কখনও কোন প্রাক্তনের নামে নিন্দা শোনা যায় না। আস্তাভাজন হ'তে হলে কতটা সতর্ক থাকা দরকার সেই শিক্ষা যেন গোপালের কাছ থেকেই রপ্ত করে সমরেশ।

“ওঠেন; একটা ভাল কাপড়-জামা পরেন দিকি। এখন টান ধরেছে একটু। গাড়ি বলা আছে, আপনাকে নিয়ে যাব একখানে"- গোপাল বলে।

“কোথায় যাব এই দুর্যোগের মধ্যে? - বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে সমরেশ।

“বেশিদূর না- এই কাছেই। এক পুরাতন জমিদার বাড়ি; ঠাকুর দালানে মায়ের পুজো হয়। কাঠামোতে মাটি পড়েছে” - উত্তর দেয় গোপাল।

দুর্গাপুজো এসে গেল প্রায়। এখন আর পুজোর সবকটা দিন মায়ের কাছে, পাড়াতে কাটানো সম্ভব হবে না। এবার যা পরিস্থিতি! হয়ত যাওয়াই হবে না বাড়ি।

জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নেয়। গোপালকে না বলা বেশ কঠিন এক কাজ। ধীরপায়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে বসে গাড়িতে। পিছনের এক সিট দখল করে গাড়ি চালাতে আদেশ দেয় গোপাল ।

হাইওয়েতে উঠে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গাড়ি নেমে যায় ডানদিকে গ্রামের রাস্তায়। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তার ঈঙ্গিতে গাড়ি থামে।

"স্যার, আপনি গাড়িতে খানিক বসেন। আমি এই এলাম বলে।" - একথা বলে গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটা দেয় গোপাল। হারিয়ে যায় অন্ধকারে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই ফিরে আসে , মাঝবয়সী এক সুদর্শন পুরুষের সাথে । পরনে তাঁর একটা সাদাধুতি - আটপৌরে করে জড়ানো। কাছে এসে করজোড়ে তিনি বলে উঠেন, "নমস্কার স্যার। কী সৌভাগ্য - আপনি এসেছেন আমাদের বাড়ি! আসুন, আসুন ভিতরে যাওয়া যাক। বাড়ির সবাই আপনার জন্য অপেক্ষায় আছে। অধমের নাম নিশিকান্ত সান্যাল।"

প্রাথমিক অভিবাদনে বেশ একটা আত্মশ্লাঘা অনুভূত হয় সমরেশের । সাথে কিঞ্চিত আড়ষ্টতা। যাই হোক, নিশিকান্তকে অনুসরণ করে এগোতে থাকে। বাড়িতে ঢোকার মুখে পাড়ার এক চায়ের দোকান, সামনে বেঞ্চপাতা। কিছু যুবক ছেলে গল্প-গুজবে মেতে আছে।

"ও গোপাল-দা; সাহেবকে নিয়ে এলে বুঝি?"- হাঁক দিয়ে ওঠে তাদের মধ্যে একজন, "তা- আমাকে জানালেই পারতে আগে- ভাগে!"

গোপাল নিরুত্তর থাকে। নিশিকান্তর মুখে একটা বিরতির ছাপ ফুটে ওঠে যা এই আলো- আঁধারিতেও সমরেশের নজর এড়াল না।

বেশ বোঝা যায় দেখে, তাঁরা একটা পুরানো জমিদার বাড়িতে এসেছে। তিনদিকে দালান, কেবল উত্তর দিক খোলা, ওখানে দেবালয়। মাঝে বেশ খানিকটা খোলা আঙিনা। সেখানে জড়ো হ'য়ে আছেন বাড়ির মেয়ে-বৌ রা । মাটিতে নামানো ল্যাম্পের স্বল্প আলোয় কারও মুখ স্পষ্ট দেখা সম্ভব নয়। নিশিকান্ত তার মেয়েকে নির্দেশ দেন হ্যাজাক জ্বেলে আনতে। দ্রুত আলো হাতে ফিরে এসে সে আদেশ পালন করে।

"এটি আমার কন্যা- নমিতা। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবার।" কন্যার পরিচয় দেন নিশিকান্ত। এই অবসরে বাড়ির বউরা ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসেন এক বৃদ্ধাকে। কিছুটা সময় লাগে তাঁর , লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়াতে। তারপর, ক্ষীণ কষ্টে বলেন, " নমি রে, লম্ফটা ভাল করে তুলে ধর - একটু মুখ-খান দেখি সাহেবের"। নমিতা আড়ষ্টতার সাথে আদেশ পালন করে।

"আহ্ হা! বেশ চাঁদ বদন মুখ ! নিশ্চই বড় বংশের সন্তান তুমি বাপু, মায়ের কোল আলো করে এয়েচ" বৃদ্ধা স্বগোতোক্তি করে ওঠেন। সমরেশ সঙ্কুচিত বোধ করে ।

"আমার মা। চলুন, ঠাকুর দালান দেখিয়ে আনি এবার আপনাকে"। নিশিকান্ত পরিস্থিতি সামাল দেবার প্রয়াস করে।

প্রতিমার কাঠামোতে মাটি লেপা হয়েছে। তখনও কাজ চলছে। ভেজা বাতাসের কারণে মাটিতে টান ধরতে সময় বেশী লাগছে।

"এবার মনে হয় তাপ দিয়ে মূর্তির কাজ সারতে হবে; জল- হাওয়ার যা গতি দেখছি।" নিশিকান্ত বলে ওঠেন।

"দেখে মনে হয় তো আপনারা পুরানো বর্ধিষ্ণু পরিবারের মানুষ।" - কৌতুহলী সমরেশ বলে ওঠে।

" তা কিছুটা সত্য", বলেন নিশিকান্ত , " চার পুরুষ আগে দুই ভাই এসেছিলেন ওপার বাংলা থেকে ভাগ্যান্বেষণে। এইসব এলাকা তখন সুন্দরবনের আওতায় ছিল। চারদিকে মানগ্রোভ গাছের জঙ্গল। সাহেবরা সবে তখন জমি জরীপের কাজে হাত দিয়েছেন। দুই ভাইয়ের কপালে জুটে যায় ঠিকাদারির কাজ। বুদ্ধি আর পরিশ্রমের ফলে রাতারাতি সদয় হন ভাগ্যলক্ষী। এই পুরো গ্রাম ছিল আমাদের জমিদারি। প্রজাপালন আর চাষবাস ক'রে দুই পুরুষ ভালই চলেছিল।"

"তারপর?" - সমরেশ অজান্তেই প্রশ্ন করে ওঠে।

" তারপর আর কি! এখন , না আছে জমি - না রইল জমিদারি । এখন গ্রামের সবাই আমরা এক। তবে এই পুজো সেই থেকে এখনও হ'য়ে আসছে। গ্রামের মানুষজনও হাত বাড়াই। পুজোর দিনগুলো গ্রামের ছোটবড় সবার কাছেই আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে থাকে এই পুজো।"- নিশিকান্ত উত্তর দেন।

এই প্রজন্মে আপনারা কতজন ভাই- বোন ? সবাই কি এই বাড়িতেই আছেন?"- সমরেশ জানতে চায়।

" খুড়তুতো- জ্যাঠতুতো সবাইকে নিয়ে বারোজন" - সপ্রতিভ উত্তর দিয়ে ওঠেন এক মাঝবয়সী বৌ- "এখানে আমরা সাত-জা আছি । বড়দি , সর আর রাধা আসে নি। একদশী যে আজ! ঘরে ব্রত পালন করছেন। আমার দুই খুড়াতো দেওর বিয়ে করে নি। ননদরা সাত।"

সমরেশ মনে মনে তারিফ না করে পারেনা মহিলার প্রত্যুতপন্নতার।

“এই বাড়িতে সবার স্থান সঙ্কুলান হয় না। কয়েকভাই ভাই তাই পরিবার নিয়ে পাশেই ঘর করে আছে। " সংযোজন করেন নিশিকান্ত।

ঘন আঁধার হয়ে আসে চারদিক। মশার আগমন বেড়ে ওঠে চারদিক খোলা বলে। পাশেই ব্যাঙের গোঁঙানি শোনা যায়।

চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির হয় নমিতা, সমরেশের জন্য বিশেষ কাপ-প্লেটের ব্যবস্থা হয়েছে। চা'য়ে দ্রুত কয়েক চুমুক দিয়ে বিদায় নিতে চায়।

“পুজোর দিন গুলোতে এয়ো কিন্তু বাবা। আর যাই না হোক, সন্ধিপুজোয় এসো। মনে ধরে যা চাইবে আমার দুগ্গামায়ের কাছে, সেটি ঠিক ফলবে "– কাঁপা গলায় বলেন বৃদ্ধা।

মাথানুয়ে দুহাতে তাঁর চরণ স্পর্শ করে সমরেশ। সারা দিনের জমা এক বিরক্তির মাঝে এই পরিবেশ এবং বিশেষকরে শেষ মুহূর্তটা মনে একটা আনন্দানুভূতি আনে তার।

“নিশ্চয়ই আসব"- খুশি মনে বলে ওঠে সমরেশ এবং বিদায় নিতে উদ্দত হয়। নিশিকান্ত গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে চাইলে সমরেশ তাঁকে নিরস্ত্র করে পা বাড়ায়।

হঠাত চায়ের দাকান থেকে একলাফে নেমে আসে সেই যুবক। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই বলে, "গোপালদা আমি উঠলাম। মেন রোডে নেমে যাব।”
কারও প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করে পাড়ির পিছনে চড়ে বসে। গোপাল কোন উত্তর দিল না।

“নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে পুজোর নিমন্ত্রণ পেয়েছেন স্যার। অবশ্যই আসবেন কিন্তু। খুউব ভাল লাগবে। আমাদের পুরুত-ঠাকুরের মন্ত্রপাঠ খুব সুন্দর আর স্পষ্ট। পুজোর দিনে গোপাল-দা নাইবা যদি থাকে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। এই এলাকায় আমাকে সবাই চেনে। হাইরোডে মোড় এসে শুধু বলবেন কাজলদের বাড়ি - পুলিশের ডাক তোলে। যে কেউ দেখিয়ে দেবে।”

গাড়ি মেনরোডে পৌঁছায়। যুবক আবার এক লাফ দেয় গাড়ি থেকে। দ্রুত হারিয়ে যায় অন্ধকারে ।।

*Apart from Modernisation - Rumku Chowdhury*

# পথে চলে যেতে যেতে

শুভা আঢ্য

কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী না হলেও, শয্যাবন্দী হয়ে আছি। শল্য- চিকিৎসার প্রহারে শরীরটা এক জায়গায় স্থিত হতে বাধ্য হয়েছে। গতিতে পড়েছে যতি, আর সহসা এই গতিহীনতা,পথ খুলে দিয়েছে নানান ভাবনার আসা যাওয়ার।

আজ সকাল থেকে, আর সবাইকে ছাপিয়ে একটি ভাবনা, আমার মনে বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে চেপে বসেছে। সেই যে জন্ম মুহূর্ত থেকে আমি শুরু করেছি পথ চলা ---এ পথ আমায় কোথায় নিয়ে চলেছে তার কি কোনও হদিশ আছে ? আজ এই ভাবনাটির চারপাশে অন্য ভাবনা গুলো গোল হয়ে বসে আমায় যেন ডেকে বলল, তাইতো চলেছো তো, কিন্তু যাচ্ছো কোথায়? এ পথের শেষ কোথায়? তাদের বলি, থামো থামো একটু ভেবে দেখি।

<u>তাইতো? পথ আছে, তাই চলছি আর চলছি ! সে চলা আমাকে কোন এক উদ্বেল নীল সাগর পারে কোন শুভ্র মৌন তুষার মৌলি শৈলচূড়ায়, কোন, শান্ত ছোট নদীটির পারে,ঘুমন্ত, ছায়া ঢাকা ছোট্ট</u> গ্রামের কোলে নিয়ে যাবে তার ঠিকানা কি আমার জানা আছে? কই, দিনের হাজার কাজের মাঝে এ কথা তো ভাবা হয়নি?
সেই যবে থেকে মনে আছে , শুনেছি কেবল, ওঠো ওঠো, চলো চলো, এই কাজ করতে হবে, ওই কাজটি বাকি রইল-- পিছিয়ে পড়লে তো চলবে না,!সবার সঙ্গে চলার স্রোতে ভেসে চলেছি , কোথায় কেন,---- এত সব ভাবার সময় কোথায়?

কবে যেন শুরু হয়েছে এই যে পথ চলা, তার শেষ কোথায়? ঠিক! ঠিক!! কোথায় চলেছি? এর আগে তো এই কথাটা নিয়ে কখনও ভাবিনি। একটুকুও না! একেবারেই না!! শুধু পা ফেলা আর তোলা। দিনের পর দিন আসে রাতের পর রাত। ঋতুর পর ঋতু আসে নানা রূপ ধরে, দিন গুনে গুনে বছরের পর বছর যায় চলে। তাদের পাশে পাশে আমিও চলি। কোথায় যাচ্ছি, কেনই বা যাচ্ছি সে কথা তো মনে আসেনি রোজকার ব্যস্ততার মাঝে। এই বিশাল পৃথিবীতে চলতে চলতে দেখা হলো কত আশ্চর্য্যের ,কত বিস্ময়ের, কত স্বর্গীয় সৌন্দর্যের সঙ্গে, আর তারই পাশে পাশে দেখলাম, কত অন্যায়, কত নৃশংসতা, কত মিথ্যার , কত বীভৎস হিংসার অসুন্দর প্রকাশ!!

চলার পথে কত নতুন জনের সঙ্গে দেখা হলো, কত মানুষ কাছে এলো, কেউ রইলো বন্ধু হয়ে, কেউ বা অন্য পথে গেল হারিয়ে। কেউ হাতে পরালো চিরকালের ভালোবাসার রাখী, বিনা সুতোর মালায় বাঁধা পড়ল কেউ। কোথাও আপনজনের ভালোবাসার গহীন জলে দিলাম ডুব, কোথাও পেলাম সমস্ত মন আলো করা স্বর্গীয় শিশুর হাসির পসরা।

সামনে চলার পথে কে আমাকে পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে । কোন এক অমোঘ ইঙ্গিতে শুধু চলা, আর এগিয়ে চলা। ছিলনা কোনও ভুল শুধরে নেবার উপায়। শুধু চলা, আর এগিয়ে চলা। তবে কখনো বা ক্ষণিক থেমে পথের ধারে বসে একটু জিরিয়ে নেবার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো কুড়িয়ে নিয়েছি মিষ্টি কোনো স্মৃতি, একঝুড়ি মন ভোলানো হাসি, কিংবা কারো হাতের মালার সুগন্ধ। সেগুলি লুকিয়ে থাকে মনের আনাচে কানাচে, হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে যায় , মনে বুলিয়ে দিয়ে যায় ভুলে যাওয়া সুখের পরশ। কখনো পথের ধরে বেঁধেছি ঘর, আবার নেমেছি পথে। থেমে যাওয়ার কিংবা ফেলে আসা পথে ফিরে যাবার কোনও অবকাশ ছিল না। কোন এক অমোঘ ইঙ্গিতে শুধু চলা, আর এগিয়ে চলা।

এ নিয়ে যখন এতদিন কোনও ভাবনা ছিলনা তাহলে আজ কেন আমাকে তাই নিয়ে ভাবতে বসতে হবে ? এখনো তো সে চলা থামেনি, গতি কিছুটা কমেছে এইমাত্র। যাত্রা শুরু হয়েছিল এক উজ্জ্বল ভোরের আলোয়, আকাশে তখনও শুকতারা একা জেগে ছিল, বাতাস ছিল সুমধুর । পেরিয়ে এসেছি অনেকখানি দূরের পথ। পশ্চিমে নানা রঙের আলোর খেলা খেলে ছুটি নিয়েছে রবি। এখনো বসেনি তারাদের আসর । জানি রাতের আঁধারে ওরাই আমায় বন্ধুর মতো পথ দেখাবে। আমি শুধু চলবো, যতক্ষণ পারি। তারপর,? তারপরের গল্প আমার জানা নেই, সে ভার আমার সে অজানা রচয়িতার , যে চিরদিন আমাকে চেনায় এই চলার পথটি। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ঘেরা পথেই এখন আমার চলা। অতীতের এখন ওখান থেকে খুঁজে পাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া,

সঞ্চয়গুলি আমার চলার পথের পাথেয়। সেই সঞ্চিত ধনেই আমার পাত্রটি পরিপূর্ণ। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি, এ যাত্রা তা আর জানা হলোনা।

যতদিন যাবার পথ থাকবে সামনে ততদিন চলবে আমার এগিয়ে  চলা। এ পথের শেষ কোথায় তা নাইবা জানা হলো!

# অলওয়েস কানেক্টেড

## শুভ্র চ্যাটার্জি

ইচ্ছে ছিলো অনেক কিছু
লিখতে পারলাম কই,
যেমন চলছে তেমনই চলুক
যুগের হাওয়ায় বই।

ডিজিটাল হলো মন্ত্র এখন
সর্বদা থাকি যুক্ত,
ধর্ম, রাজনীতি, কিংবা কৌতুক,
মতামত এখন মুক্ত।

বন্ধুরা এখন আঙুল ডগায়,
পাঠিয়ে দিই টেক্সট,
উইকেন্ড আসতে বাকি দুদিন
প্ল্যান দরকার নেক্সট।

ছুটছে দিন, ছুটছে সময়,
ছুটে চলেছে বিশ্ব,
এতো ছোটার মাঝে হঠাৎ
কেনো লাগে নিঃস্ব।

দম ফেলার সময় নেইকো
বিরতি নেইতো শর্তে,
তবুও কোথায় লাগে ফাঁকা
এতো বন্ধুর আবর্তে।

প্রযুক্তি দিল প্রতিশ্রুতি
গাঢ় করবে বন্ধুত্ব,
কিন্তু বরং কোথায় যেনো
বেড়ে গেলো দূরত্ব।

যন্ত্রটা হাতে কব্জা করে
লিখে চলেছি অনর্গল,
কিন্তু কখনো লিখিনি, বন্ধু,
মনের কথাটি বল।

অনেক হলো দেশের কথা
দশকে নিয়ে চর্চা,
একদিন শুধু দুজনে বসি
নেইকো কোনো খরচা।

লিখে নয়, মুখে জিগাই,
কেমন চলছে বন্ধু?
তুইও কি আমার মতো
পারি দিচ্ছিস সিন্ধু?

উথাল পাতাল স্রোতে ভেসেও
তোরো লাগে একা?
তুইও কোথাও আমার মতোই
লুকিয়ে রেখেছিস ব্যথা?

*Owl*
*Idhant Chakravarty*
*Age: 12 yrs*

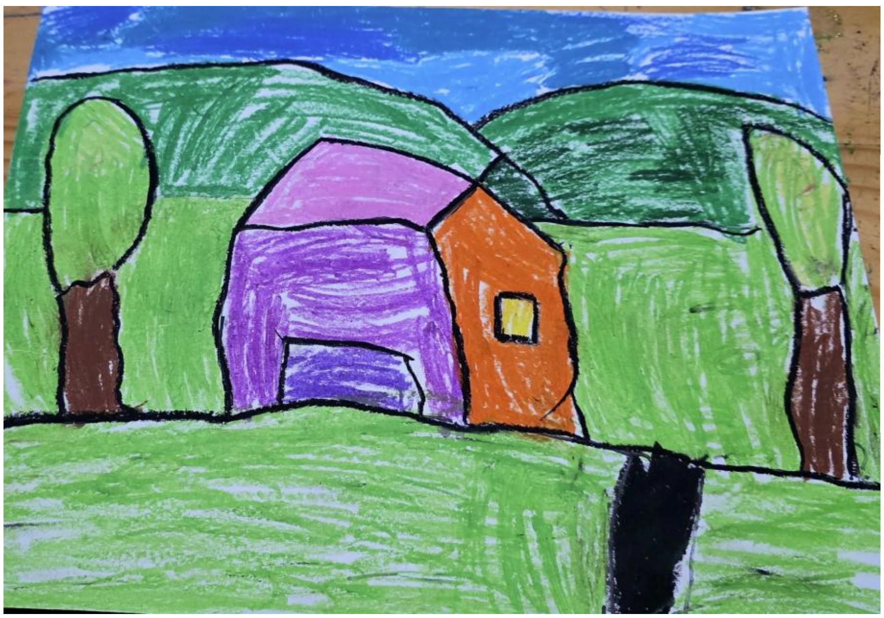

*Sobuj Rajar Desh*
*Kenosha Mahbub (4)*

*Notun sokal*
*June Bhattacharya (7)*

# প্রতীক্ষা
## স্নিগ্ধা ঘোষাল

শয্যাশায়ী পঙ্গু অমলেন্দু স্ত্রীকে ডেকে বলে, ওগো শুনছো, খোকা ফিরল হাসপাতাল থেকে? আর কত রাত অবধি রুগী দেখবে? শেষে ছেলেটাকে না ধরে।

পাঁচ বছরের নেহার চোখের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দ্যায় রুমা, আর কটা দিন মা ...তারপর দোকান খুললেই তোমাকে জন্মদিনের doll house কিনে দেব।

তাঁতি হাঁটু গেড়ে বসে কপালে হাত দিয়ে তার স্তূপ করে কাঁথা stitch শাড়ি গুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, কে জানে কবে হবে বিক্রি, কবে আসবে দুটো টাকা ...এদিকে চালের ড্রাম ত খালি হয়ে এলো|

বাঁকুড়ার গ্রামের মেধাবী ছাত্র, কান্ত মুখে মাস্ক পরা স্কুল মাস্টারের রাস্তায় পথ আগলে ধরে বলে, কবে স্কুল খুলবেক মাস্টর? মুখে পট্টি বেঁধে, ছয় হাত দূরে বসে কিলাস শুরু কর না ক্যানে?

রাত্রের অন্ধকারে পেটের উপর সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে নিজেকে আশ্বাস দেয় গর্ভবতী নিরা, বলে, তোর জন্ম হতে হতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

Grocery Store এ রাত্রের ডিনারে Guacamole বানাবে বলে বড় বড় দুটো Avocado তুলে দাম দেখে নামিয়ে রাখে Maria – অনেক দাম, এখনো দুধ কেনা বাকি – পরে না হয় sale এ দিলে অনেকগুলো কিনে রাখবে|

উচ্চ শিক্ষিত বেকার Ricardo এক হাতে PhD স্নাতকোত্তরের ডিপ্লোমা, অন্য হাতে চাকরী খোঁজার ব্যর্থতার গ্লানি ভরা পেয়ালায় চুমুক দিয়ে – ঘুম ভাঙ্গা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে, এতো ঋণ, এতো ঋণ, কি করে শোধ করব এতো ঋণ|

Black Lives Matter এর জনস্রোতে, George Floyd এর ছয় বছরের মেয়ে, কাকার কাঁধে বসে, পুলিসের হাতে বাবার অকালমৃত্যুর বিচারের প্রতীক্ষায়, সাংবাদিক কে বলে,
– My Daddy changed the world |

শ্বেতাঙ্গিনি Emilyর কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমিক তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,
– আর কটা মাস, ...নতুন চাকরীটা পেলেই তোমার মা বাবার সাথে দেখা করে বুঝিয়ে বলব, আমাদের ভালবাসার কোন রং নেই।
– আমাকে পেয়ে তোমাকে যাতে মা বাবাকে হারাতে না হয়, তাই তো এই প্রতীক্ষা।

Chinatown এর Mom and Pop shop এর চীনে বাবসায়ি, Sheo Yen Chen বন্ধ দোকানের কাঁচ পুঁছতে পুঁছতে শূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে, বৃদ্ধ স্বামীকে বলে, এভাবে আর কত দিন চালাতে পারব আমরা!

গ্রাম বাংলার Amphan এর ধ্বংসের যুদ্ধে সব হারিয়ে ঘরছাড়া নিসঙ্গ কমলা, মাটিতে ছেঁড়া মাদুর পেতে শুয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে এক নতুন সূর্যের ভোরের প্রতীক্ষায়|

সদ্যবিবাহিতা, শান্তিনিকেতনে বড় হওয়া, তনুশ্রী সুদিনের প্রতীক্ষারত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ডাক্তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে গুন গুনিয়ে ওঠে রবির আশাবানি,

*হবে হবে প্রভাত হবে, আঁধার যাবে কেটে*
*তোমার বানি – সোনার ধারা পরবে আকাশ ফেটে*

*Written during the shadow of Covid19 years*

# Mailbox অভিযান

ঋত্বিক সেন

সকাল সকাল email account তা খুলেই মেজাজ তা খিচড়ে গেলো। না, নতুন করে কোনো বিকট email এর অবির্ভাব ঘটে নি। কেউ আমায় টাকা দিতে চাইছে না - কেউ নিতেও চাইছে না। আমার গাড়ির extended warranty নিয়ে অজানা-অচেনা সুনাগরিক দের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার কোনো উপায়ের সংকেত ও চোখে পড়লো না। সব একদম শান্ত, নিরিবিলি - ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। বিপদটা হলো screen এর নিচে ডানদিকে একটা ছোট্ট বার্তা দেখে। "Your email storage is full. Please free up space to continue to send or receive emails".

ভাবছেন এতে এতো চটে যাবার কি আছে? অনেক কারণ আছে। বছর কুড়ি আগে যখন এই email account টা খুলেছিলাম, তখন email company আশ্বাস দিয়েছিলো যে আমায় কোনোদিন email delete করতে হবে না। সমস্ত স্মৃতি চিরকালের মতন কয়েদ হয়ে থাকবে এই ছোট্ট inbox টার মধ্যে। এমনকি প্রথম কয়েক বছর তো email delete করার কোনো উপায় ছিল না। ফলে আমিও কোনোদিন পুরোনো email delete করার চেষ্টাও করিনি। বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন, কর্মক্ষেত্রের email, নিজেকে পাঠানো জরুরি document, কয়েকশো পুরোনো ছবি - আমার জীবনের শেষ দুই দশকের ইতিহাস সযত্নে আগলে রাখা আছে এই email account এ। তবে, ইদানিং কালে রাজ্যের email, marketing এর জঞ্জালে ভরে গেছে inbox. Credit card, home loan, car loan, কোটিপতি হবার উপায়, রোগ হবার উপায়, প্রেমে সাফল্যের উপায় - ক্রেতা, বিক্রেতা আর ঠকবাজদের কুরুক্ষেত্রে আমি জেরবার হয়ে গেছি। হাজার হাজার অবান্তর, অনর্থক, ওঁচা email এ ভোরে গেছে inbox. এই সব আগাছা পরিষ্কার করা যে কি দুরহ কাজ সে আর বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু আর কোনো উপায় ও নেই। তাই মনে সাহস নিয়ে, হাত গুটিয়ে নেবে পড়লাম "স্বচ্ছ mailbox" অভিযানে।

শুরু করলাম অবান্তর email গুলো দিয়ে। কিন্তু প্রথম দুপাতা পেরোতেই বুঝতে পারলাম যে এই গতিতে এগোলে আমার সারা জীবন লেগে যাবে এই কার্য সিদ্ধি করতে। ঠিক করলাম, পিছন থেকে শুরু করি। মানে সবচেয়ে পুরোনো email গুলো থেকে delete করা শুরু করি। এতো পুরোনো email এর বোধয় অরে প্রয়োজন হবে না। নিজের ওপর বেশ গর্ব বোধ করে সোজা চলে গেলাম একদম শেষের পাতায়। এইবার ঘচাং-ফু করে সব delete করে দেব। কিন্তু এখানেই শুরু হলো বিপদ। প্রথম email তা ২০০৫ সালের জুন মাসে - বাল্য বন্ধু রাজীবের email।

“Congrats ভাই, খাওয়াবি কবে?" কিসের congrats? এমন কি ভালো ঘটনা ঘটেছিলো সেদিন যে আমি ওকে খাওয়াবো? তখন আমি কলেজ পড়ি। বোধয় পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। delete করতে গিয়েও করলাম না। এই account এর প্রথম email, এটা থাক।

পরের emailটা প্রদীপ্ত ব্যানার্জীর কাছ থেকে। একটা এটাচমেন্ট এ একগুচ্ছ shopping mall এর ছবি। সাবজেক্ট লাইন - "Dubai Documents". যাব্বাবা! - এই লোকটা আবার কে? একে তো চিনি না। আর এরম একটা গম্ভীর subject লাইন দিয়ে ভুল ভাল দোকানের ছবি পাঠিয়েছে? আমি আবার তাকে reply ও করেছি "Thank you sir ". ভারী চিন্তায় পরে গেলাম। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে দুবাই এর shopping mall এর ছবি দিয়ে আমি কি করতে চাইছিলাম? এমনি তে আমি বেশ সাহসী প্রবৃত্তির মানুষ, কিন্তু এইসব দুবাই টুবাই ব্যাপার গুলো নিয়ে একটু অস্বস্তি হয়। কি জানি কিসে ফেঁসে যাবো! চটপট delete করে দিলাম। আর কোনো চিহ্ন নেই।

পরের email সেই অগাস্ট মাসে - সুব্রত মল্লিক এর থেকে। সুব্রত আমার কলেজের সহপাঠী ছিল। আমার ঠিক পরের রোল নম্বর। অনেক এসাইনমেন্ট আর প্রজেক্ট আমরা একসাথে করেছি। বেশ মেধাবী ছাত্র ছিল। কলেজের পরে আর সেরম যোগাযোগ ছিল না। কি জানি আজ-কাল কি করছে। Facebook আর LinkedIn থাকার দরুন জানতে পারলাম সুব্রত এখন বেঙ্গালুরুতে আছে। এক বড়ো সফটওয়্যার কোম্পানিতে সিনিয়র ম্যানেজার। ভালো লাগলো। সুব্রতর email টা খুললাম - "Implementation of NEMO on Linux", সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটির একটা রিসার্চ পেপার। একবার চোখ বুলিয়ে বুঝলাম যে আমি কিচ্ছুই বুঝলাম না। অথচ আমি বিজ্ঞের মতন এর একটা লম্বা reply ও করেছি। তাতে আবার গুরুগম্ভীর কঠিন কিসব শব্দ ও ব্যবহার করেছি। নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম - ২০০৫ সালে আমি এতো জ্ঞানী ছিলাম? তাহলে এখন এরম অজ্ঞ কি করে হয়ে গেলাম? শুনেছিলাম বয়সের সাথে সাথে মানুষের পান্ডিত্য বৃদ্ধি পায় - আমার ক্ষেত্রে তার উল্টো। বুঝলাম মগজের ব্যায়াম, করা বন্ধ হয়ে গেছে।

উৎকৃষ্ট মানের চিন্তা ভাবনা প্রাক্টিস করতে হবে। তাই সুব্রতর emailটা delete করলাম না। ওটা দিয়েই শুরু হবে আমার মগজাস্ত্রে শান দেওয়া।

কিন্তু মগজে হাত দেওয়ার আগেই হৃদয়ের তারে টান পড়লো। পুরোনো কিছু প্রেম পত্র চোখে পড়লো। অবশ্য প্রেম পত্র বলাটা বোধয় ঠিক হবে না । কারণ এই পত্রে প্রেম কম, - আদিখ্যেতা আর ন্যাকামো বেশি। "ঘুম থেকে উঠলে?", "ঘুমিয়ে পড়েছো?", "জেগে আছো?", "কি করছো?", "কি খাচ্ছো ?" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েক পাতায়। দুঃখের বিষয় টা হলো যে Amazon Alexa র এর সাথে আমি আজকাল এর থেকে উচ্চ মানের আলোচনা করেই থাকি। তাই আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ নেই যখন এই প্রেমের প্রশ্ন বানের email বর্ষণ একদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। "Select all" করে এই সমস্ত email এক্কেবারে delete করে দিলাম। এইসব মুর্খামির উদাহরণ লুপ্ত থাকাই ভালো।

email এর সময়রেখা ধরে চলতে চলতে এখন ২০০৮ সালে এসে পড়েছি। কলকাতা ছেড়ে সবে বেঙ্গালুরু এসেছি চাকরি সূত্রে। কিন্তু ইনবক্স এখনো তাজা পুরো বন্ধুদের emailএ। অকাজ এর forward email, আড্ডা, পুজোয় ঠাকুর দেখার প্ল্যান, একে ওপরের সাথে ঠাট্টা - এসব যেন লেগেই থাকতো দৈনন্দিন। WhatsApp / IP calling এর আগের যুগ। সস্তায় যোগাযোগ রাখার এই একমাত্র উপায়। একটা একটা করে email পড়ছি আর নিজের মনেই হেসে যাচ্ছি। সন্দীপ এর ভূতের ভয়, ইন্দ্রজিৎ এর বাংলায় ফেল, সৌমেন এর লাল জুতো, রাজীবের পুষ্ট শরীর - কিছুই বাদ যায় নি। সে এক নির্ভেজাল সময় - বন্ধুদের deliberately offend করাতে কেউ offence নিতো না। এই email গুলোর হাত ধরে আমি যেন আবার সেই পুরানো দিনেই ফিরে গেছি।

ধীরে ধীরে কলকাতার বন্ধুদের সাথে email আদান-প্রদান কমে এলো। দিনে ৩-৪টে থেকে মাসে ২ টো তে এসে ঠেকেছে। সবাই যে যার নিজের জীবন আর কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। অথচ আমার ইনবক্স কিন্তু তখনও ভরে চলেছে। বেঙ্গালুরু এ নতুন বন্ধুদের আবির্ভাব। আমার সহকর্মী মান্দীপ ও গঙ্গা। জীবন যুদ্ধের সেই অধ্যায় আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। মান্দীপ পাঞ্জাব এর ছেলে। পড়ুয়া, সাধা-সিধা, এক্কেবারে শান্ত শিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট ভদ্রলোক যাকে বলে। আর Ganga ঠিক তার উল্টো - ডানপিটে, সাহসী মারাঠি মেয়ে। আমাদের এই ৩ মূর্তির সমস্ত কুখ্যাতি বিশদ বিবরণ ছড়িয়ে আছে ইনবক্স এ। Mandeep এখন দিল্লী তে। বছরে একদুবার ফোনে কথা হয়। আর গঙ্গা? তার সাথে শেষ কথা হয়েছিল ২০২১ জুলাই মাসে। সেই নভেম্বর এ গঙ্গা আমাদের সবাই কে বিদায় জানায়। ব্রেস্ট ক্যান্সার। তার শেষ email টার জবাব দেওয়া হয়নি আমার।

পুরোনো স্মৃতি মাখানো email গুলো পড়তে পড়তে মনটা ভারী হয়ে গেলো। চোখের দৃষ্টি বোধয় একটু ঝাপসা হয়ে এসেছে। পুরোনো email পিছন থেকে delete করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে backfire করেছে। শেষ ৩ ঘন্টায় আমি মাত্র ১৫২টা email delete করতে পেরেছি। আমায় করতে হবে কয়েক লক্ষ। মাঝখান থেকে মন মেজাজ আরো খারাপ করে পুরো দিনটাই মাটি হবার জোগাড়। এই ভাবে হবে না। ৫ বছর আগের যত email এসেছে সেগুলো সব সিলেক্ট করলাম। সে লক্ষ লক্ষ email। বেশ কয়েকবার delete বাটন এর ওপর মাউস টা নিয়ে গেলাম, আবার ফিরিয়ে আনলাম। দ্বিধা আর দ্বন্ধে ভরা এক সংঘর্ষ চলছে মনের ভিতর। কিছু অমূল্য স্মৃতি হারিয়ে যাবার আশংকা। তখনি একটা আধুনিক ইংরিজি গানের কথা মনে পড়লো - "Nostalgia is one hell of a drug". গানের কথা গুলো মনে করিয়ে দেয় অতীতকে আটকে ধরে রাখার পরিণাম। স্মৃতির পিছুটান জীবনে এগিয়ে যাবার রাস্তায় বাঁধা আনে।

সত্যি তো দিব্বি ফুরফুরে মেজাজে email delete করতে বসেছিলাম এখন মুখ গোমড়া করে, দার্শনিক হয়ে প্রবন্ধ লিখছি। নিকুচি করেছে। এক নিঃশ্বাসে delete বাটন তা ক্লিক করে ফেললাম। কয়েক লক্ষ email - একটু বোধয় সময় লাগে কার্য সিদ্ধি হতে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একটার পর একটা পাতার সংখ্যা কমে আসছে। প্রথম কয়েক সেকেন্ড একটা আতঙ্ক যেন চেপে ধরলো আমাকে - কিন্তু আশ্চর্য্য ভাবে যত পাতার সংখ্যা কমতে থাকলো তত যেন মনটাও হালকা হতে থাকলো। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সব পরিষ্কার। মন আর inbox দুটোই খালি। রয়ে গেছে Ganga র করা শেষ email টা। Reply লিখলাম - "ভালো থাকিস বন্ধু। এবার দেখা হলে কিন্তু আর veg খাবো না"। Reply টা পাঠালাম আর তার সাথেই গঙ্গার শেষ email টাও delete করে দিলাম।
এবার নতুন স্মৃতি বানানোর পালা।

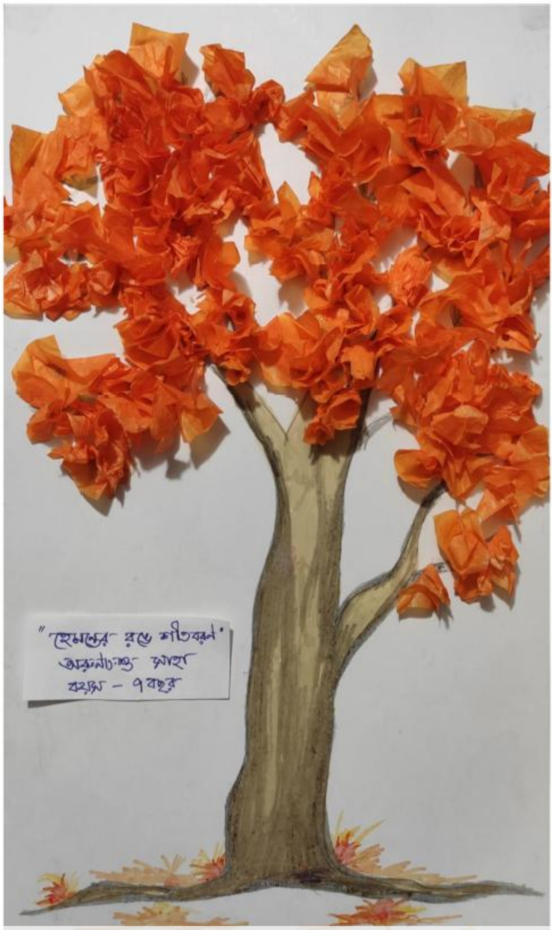

Hemanter Ronge Sheetboron - Arunangshu Saha (7)

Believe yourself - Rajonya Saha (9)

*Sunrise at Moraine Lake - Adrita Sengupta (11)*

# মীটিং
## প্রদীপ্ত দে

টিভিটায় নিউজ চলছিল। সুন্দরী সঞ্চালিকা খবর পড়ছিলেন,
'গভীর জঙ্গলের ভেতর, অফ সীজনে, ট্যুরিস্ট শূন্য অবস্থায়, প্রাণহানি ক্ষয়ক্ষতি সাবধানে বাঁচিয়ে, একটানা বৃষ্টি ভিজে স্যাঁতসেঁতে অবস্থাতেও কীভাবে লাগল আগুন, এ নিয়ে ঘনিয়েছে রহস্য। শর্ট সার্কিট, লং সার্কিট, বনফায়ার, দেশবিরোধীদের দ্বারা অন্তর্ঘাত, বিদেশী শক্তির দ্বারা জংলি হানা, মাফ করবেন, জঙ্গিহানা ইত্যাদি সব সম্ভাবনার কথা বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসছে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন দুটো স্থানীয় বাঁদর বিড়ি ধরাতে গিয়ে দেশলাই নেভাতে ভুলে গেছিল, আর তা থেকেই এই অগ্নিকান্ড! স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনের গড়িমসিতে বাঁদর দুটোকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে তারা পাহাড়ি সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী দেশে পলাতক হয়েছে। ফিরে আসছি একটা ছোট্ট বিরতির পর। আরও খবর জানতে চোখ রাখুন'....

রিমোট তাগ করে টিভিটা মিউট করে দিলেন অরণ্যপাল। জোরে একটা শ্বাস ফেললেন। ঘরে ছড়িয়ে স্তব্ধতা। সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট তিন পারিষদ। তাঁরা অরণ্যবিদ্যা পড়ে এসেছেন। অরণ্যপালের অধীনে তাঁরা চাকরি করেন। পদাধিকারবলে তাঁরা আঞ্চলিক অধিকর্তা।
সকলেই চুপ করে অপেক্ষায়,অরণ্যপালের নির্দেশের। তিনিই মুখ্য আধিকারিক। কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত। তাঁর রাজ্যে অগ্নিকান্ডের ঘটনাটা মিডিয়া খুব করে হাইলাইট করে দেওয়ায় ইদানীং খানিক চাপে আছেন,

- 'ঠিক আছে! গুড জব! আপাতত এই ন্যারেটিভটাই চলুক'
- ইয়েস স্যার। পাজি বাঁদর। প্রেসের মেয়েটা সাজেস্ট করেছিল সঙ্গে প্রশাসনের অপদার্থতার পয়েন্টটাও'...

হাত তুলে প্রথম পারিষদ'কে থামিয়ে দিলেন অরণ্যপাল, 'উঁহুঁহুঁ, বেফাঁস কথা বলবেন না, ভুলে যাবেন না আমরাই প্রশাসনের মুখ'...
- হ্যাঁ স্যার। স্যরি স্যার
- ইটস ওকে! শুনুন, কবি বলেছেন, 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক', যা হবার তা হয়ে গেছে, এবার আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।
- ইয়েস স্যার

দ্বিতীয় পারিষদ বললেন, 'স্যার, আরেকটা কথা। চৌকিদার যে ছিল লোকটা সে দিল্লি পালিয়েছে',
অরণ্যপাল কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু, 'পালাক। ওটা পুলিশের ব্যাপার, ওরা খুঁজুক গিয়ে। কুছ পরোয়া নেহি। আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। সবকিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। মামাটি মানুষ হয়েছেন। তিনি ওপর থেকে এটাই নির্দেশ দিয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন?
তিনটি চেয়ার থেকে সমস্বরে সাড়া এল,
- হ্যাঁ স্যার
- ইয়েস স্যার
- ইয়েস স্যার

জরুরি 'টিম ব্রিফিং' চলছিল। অরণ্যপাল বলে চলেছিলেন,'মানুষের জন্য, মানুষের পাশে বন্যপ্রাণীদের স্বার্থে বন বাংলোটি নতুন করে... এই যে মামা, বলতে না বলতেই, আসুন স্যার...বসুন'...
মামার প্রবেশ ও উপবেশন, কোনো কথা বললেন না, কখনোই বলেন না। শুধু আঙুল হেলিয়ে ইশারা করলেন মীটিং চালিয়ে যেতে। অরণ্যপাল তাঁর কথার খেই ধরেন,
- হ্যাঁ মামা, আমি এদের যেটা বলছিলাম যে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও উন্নত, আধুনিক ব্যবস্থা, আধুনিক সুযোগ সুবিধে তৈরি করতে হবে যাতে আরও বেশি করে ট্যুরিস্ট আসে! ওসব ব্রিটিশ আমলের কাঠের তৈরি পুরনো স্টাইলের বাংলো আজকাল আর চলে না। বরং ঢেলে সাজিয়ে তৈরি হবে 'রেসর্ট'। থাকবে ট্যুরিস্টদের জন্য সবরকম সুযোগসুবিধে'...

প্রথম পারিষদ আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন,
- বলছেন কী স্যার! জায়গাটা জঙ্গলের কোর এরিয়ার মধ্যে'....
- তো?! ঝাঁকড়া চুল দাড়ি লোম থাকলেই শরীরের সেই জায়গাটা 'কোর এরিয়া' সবাই জানে, পৃথিবীর গায়ে বনজঙ্গলও ঐরকমই, হেহেহেহে', অরণ্যপাল রসিকতার চেষ্টা করেন, গম্ভীর মীটিঙের মধ্যে একটু ফান এলিমেন্ট।

দ্বিতীয় পারিষদ কিছু সিনিয়র, অভিজ্ঞতা আছে। তিনি সবসময়ই ফিফটি ফিফটি খেলেন। তবু সহকর্মীর সমর্থনে মুখ খোলেন,
- স্যার, সল্ট লিক আছে, রাতে বুনো জানোয়াররা নুন চাটতে আসে,গন্ডার, হাতি, বুনো মোষ, গউর.. একেবারে চলে আসে বাংলোর হাতায়'..
অরণ্যপাল হাত তুলে আশ্বস্ত করেন,
- হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুক না! গউর ময়ূর সবাই আসুক। ওদের জন্য সল্ট লিক সেক্টর করে দেওয়া হবে। ফ্লাডলাইট বসিয়ে দেওয়া হবে'..
- ফ্লাডলাইট!?
- প্রথম পারিষদ বিষ্ময়ের সীমায়।
অরণ্যপালও কিছু পালটা অবাক, 'যাতে রাতে ছবি তুলতে ট্যুরিস্টদের কোনও অসুবিধে না হয়'
- স্যার, বন্যপ্রাণীরা ভয় পেয়ে'...
এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হন অরণ্যপাল,
- আঃ, বন্যপ্রাণী.. বন্যপ্রাণী! সবজান্তা সর্বজ্ঞানী! সব ব্যাপারে অসুবিধে! ভয় পেয়ে বুনো জানোয়াররা আর আসবে না, এই তো!?
- হ্যাঁ, স্যার
- প্রথম পারিষদ হাঁফ ছাড়েন, এতক্ষণে স্যারের মাথায় পয়েন্টটা ঢুকেছে। কিন্তু, অরণ্যপাল তাঁর ঊর্ধ্বতন দেবতা। তিনি ঈষৎ সুর তুলে বলেন, 'শুনুন মশায়',
- কত এমপ্লয়মেন্ট হবে ভেবে দেখেছেন? কাছেপিঠের গ্রামের বাইসনরা তো আসবেই। গন্ডারেরাও আসবে, নুন চাটতে চাওয়া গন্ডারের অভাব নেই দেশে! বুঝেছেন?
তৃতীয় পারিষদ সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি এতক্ষণ চুপ করে আলোচনা শুনছিলেন, মন্তব্য করেন,
- 'সিভিক গন্ডার'
সিনিয়র সহকর্মী'র সমর্থন পেয়ে অরণ্যপাল উৎসাহিত হন,
- এক্স্যাক্টলি! এই তো মাথা দিব্যি খুলছে, পয়েন্টটা লিখে নিন দিকি, কোর্ট থেকে অর্ডার এনে ট্রেনিং দিয়ে নিতে হবে',
নির্দেশটা দিলেন, প্রথম পারিষদের উদ্দেশ্যে। মীটিং এর মিনিটস মানে কার্যবিবরণী লেখার দায়িত্ব প্রথম পারিষদের। সে'ই জুনিয়রমোস্ট।
- ইয়েস স্যার'।
- ব্লু প্রিন্ট সব রেডি আছে, বুঝলেন তো! এই তো এসে পড়েছেন মিস্টার ঘুঘুপতি। মিস্টার ঘুঘুপতি ওনস আ বিগ বিজনেস হাউজ। মহাকাশে নিজস্ব উপগ্রহ বসিয়েছেন। সেখানে খেলার স্টেডিয়াম, নেচার পার্ক সবকিছু বানিয়েছেন। মামাটি'র বাঁহাত,খুব ভালো মানুষ। উনিই এরিয়াটা লীজ নিয়েছেন। রেসর্ট'টা দাঁড় করাবেন। হাজার কোটি টাকার ব্যাপার'..
- কিন্তু স্যার'...

প্রথম পারিষদের প্রচুর প্রশ্ন, থামাতে চেষ্টা করেন অরণ্যপাল। মামাটি বেশি প্রশ্ন করা পছন্দ করেননা,
অরণ্যপাল বলেন, 'শুনুন, বাংলোটায় বুকিং পাওয়া যায় না বলে খুব কমপ্লেন ছিল। এবার থেকে ব্যবস্থা এমন থাকবে যাতে বছরের অলটাইম বুকিং পাওয়া যায়। নো ওয়েটিং লিস্ট। 'রেলোয়ে'রাও এই টার্গেট নিয়ে চলছে জানেন বোধয়। এটাই এখন মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড। তার জন্যে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করতে হবে', অরণ্যপাল কিছু আবেগপ্রবণ, 'পয়েন্টটা লিখে নিন। বুঝতে পেরেছেন তো!'
- হ্যাঁ স্যার....
- নিন এবার কাজ শুরু করে দিন। মামা'... - অ্যাপ্রুভালের জন্যে মামাটির দিকে ফেরেন অরণ্যপাল। মীটিং এ এবার তাঁর কিছু বলার পালা।
মামাটি কোনো কথা বলেন না। কখনোই বলেন না। শুধু হাতের আঙুলগুলো একটু খেলিয়ে হেলিয়ে নেন, মুখে থাকে তাঁর মৃদু হাসি। ওঁর চারপাশে যারা ঘুরঘুর করেন তারা ঈঙ্গিত ঠিক বুঝতে পারে আর সেইমত চলে, চালায়।

মামাটির পাশের চেয়ারে বসা তাঁর সঙ্গী, মিস্টার ঘুঘুপতি এবার মুখ খোলেন। গোঁফের ফাঁকে চওড়া হাসেন, 'কুছু চিন্তা নেই মিস্টার সোরকার', লালছোপ দাঁতজোড়ার মাঝে একখিলি পান টুক করে ঢুকে যায়,
- আপনাদের হোলোং রেসর্ট আমি ফিরসে দাঁড় করিয়ে দিবে। একদম চকাচক! গেট ফেট সব চেঞ্জ করিয়ে দিবে। ডিসপ্লে থাকবে 'আই লাভ হোলোং'। থাকবে স্যুইমিং পুল, প্লে এরিয়া, এনক্লোজার। লোকাল অ্যানিমাল যা আছে, আছে! এনক্লোজারে অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্যাঙ্গারু এনে রাখব। ডলফিন আনাবো, ওদের জন্যে আলাদা ওয়াটার

বড়ি থাকবে। একদম ন্যাচরাল হ্যাবিটাট, বুঝলেন কি না, ট্যুরিস্টদের জন্যে ফুডকোর্ট, পাব, লিকার কাউন্টার, ডিস্কো, স্যুভেনির শপ... সোব থাকবে'...
প্রথম পারিষদ নিতান্ত আনাড়ি। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি ভুলে মিস্টার ঘুঘুপতি'র কথায় প্রতিবাদ করে বসে,
- স্যার, কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছপালা আর প্রাণী শুধু ওখানেই পাওয়া যায়। একশিঙে গন্ডার, বেঙ্গল ফ্লোরিকান পাখি, দুশো দশ ধরণের প্রজাপতি'....
মিস্টার ঘুঘুপতি বিস্তর রকমের ক্লায়েন্ট হ্যান্ডল করেছেন, শান্ত স্বরে মাপমতো বিরক্তি মিশিয়ে বলেন, 'অলরেডি বোলা তো! রেয়ার স্পিসিস কিছু থাকলে বোলবেন, উদের জন্যে আলাদা লাউঞ্জ করে দিব। সেফটি ইজ নট আ কনসার্ন'।
অরণ্যপাল মীটিং এর রাশ হাতে তুলে নেন। তিনিই এর আয়োজন করেছেন, কনভেনর। হাত তোলেন,
- 'ওয়ান্ডারফুল স্যার!'
হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে মিস্টার ঘুঘুপতি অরণ্যপাল'কে জিজ্ঞেস করেন,
- আচ্ছা, আপনাদের এখানে বাঁদর আছে বোললেন না!'..
- হ্যাঁ স্যার, কেন, আসার সময়ে দেখেননি? ওরাই তো বাংলোটার হাতায় বিড়ি ধরাতে গিয়ে স্যার',
অরণ্যপাল রিপোর্ট করতে অকপট। মিস্টার ঘুঘুপতির হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেছে, হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে থামিয়ে দেন,
- 'বাদ্দিন স্যার। বোলেন তো একটা মন্দির ভি করিয়ে দেব, হনুমানজী থাকবেন মন্দিরের ভিত্রে। বাইরে গাছের ডালে হ্যামক ঝুলিয়ে দিবো, সোন্ধেবেলায় ট্রাইবাল ডান্স হোবে, হাতি সাফারি তো থাকবেই। আপনাদের বাজেট থাকলে রোপওয়ে অর টয়ট্রেন'...
অরণ্যপালের মুখে চওড়া হাসি,
- দারুণ!
দ্বিতীয় পারিষদের চোখ চকচকে, 'অসাধারণ!'
তৃতীয় পারিষদ এতক্ষণ চুপ করে আলোচনা শুনছিলেন, মন্তব্য করেন, 'এক্সেলেন্ট!
- হেহেহেহে, থ্যাঙ্কিউ, থ্যাঙ্কিউ স্যার। ট্যুরিজমে তো সিকিউরিটি আর কমফোর্ট'ই হল কাস্টমারের জন্য আসোল চিজ, নিজের উপগ্রহটির কথা উঠে আসে ঘুঘুপতি'র কথায়, 'আমাদের ওখানে অক্সিজেন থেকে সফটড্রিংকস থেকে পপকর্ন সোবকুছু ফিক্সড রেট। সাপ্লাই স্মুথ। বুঝেন কী না! ট্যুরিস্টরাই তো কাস্টমার! '
- রাইট স্যার', অরণ্যপাল দ্রুত মতে মত মেলান। তিনটে চেয়ার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।
- হেঁহেঁ, ইয়ে, মানে, সুধু একটা কথা, মিস্টার ঘুঘুপতির গলায় হালকা অনুরোধের ছোঁয়া,
- হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার
- 'বলছিলাম কি পোরিবেস আর মানোবাধিকার ডিপার্টমেন্ট এর সাথেও তো একবার কোথা বোলতে হবে আমাকে। বুঝেনই তো! ' - মিস্টার ঘুঘুপতি গলাটা নামান,
'আপনাদের এই এরিয়াটায় কুন কুন বুনো জানভর আর পেড়পওধাদের ম্যান্ডেটরি রাখতেই হোবে, তার একটা লিস্ট আপনারা আমাকে করিয়ে দেন, বাস।
বাদবাকি যাদের থাকার দোরকার নেই, ইনক্লুডিং লোকাল ট্রাইবাল পীপল, তাদের বেবস্থা আমার লোক বুঝে লিবে...বুঝেছেন তো?!

মিস্টার ঘুঘুপতির কথার মাঝে ফোন বাজল। রিংটোন নিখাদ বাংলা একটা গান। কিশোরকুমার গেয়ে ওঠেন - 'পৃথিবী বদলে গেছে / যা দেখি নতুন লাগে'...

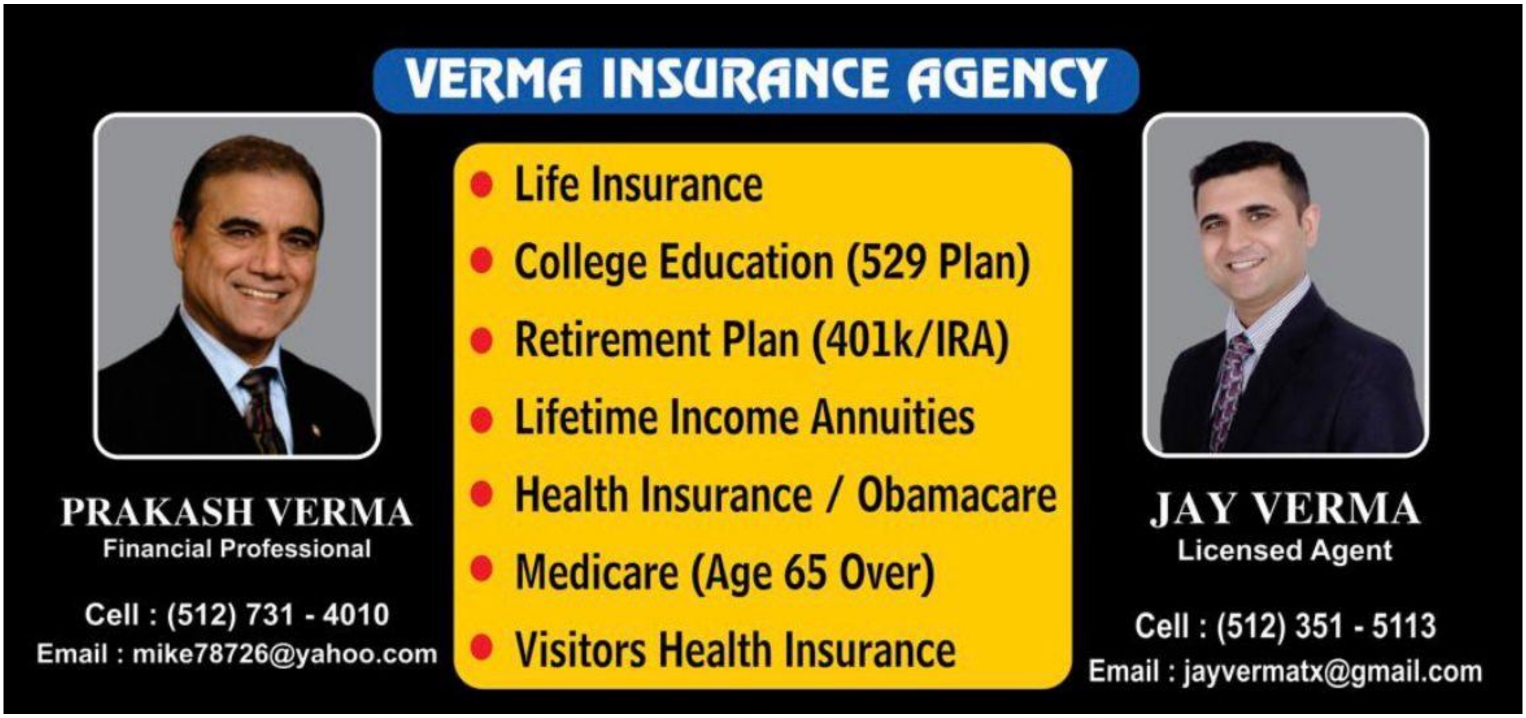
VERMA INSURANCE AGENCY
Life Insurance
College Education (529 Plan)
Retirement Plan (401k/IRA)
Lifetime Income Annuities
Health Insurance / Obamacare
Medicare (Age 65 Over)
Visitors Health Insurance
PRAKASH VERMA
Financial Professional
Cell : (512) 731 - 4010
Email : mike78726@yahoo.com
JAY VERMA
Licensed Agent
Cell : (512) 351 - 5113
Email : jayvermatx@gmail.com

PRIME FAMILY CARE
LITTY VADAKKAN APRN, FNP-C
ACCEPTING NEW PATIENTS
ANNUAL PHYSICAL / BLOOD WORK / PAP SMEAR
SAME DAY SICK VISITS
FLU/ STREP/ COVID TESTING & TREATMENT
SELF-PAY FOR UNINSURED
ALL MAJOR INSURANCES ACCEPTED
YOUR ONE-STOP CLINIC FOR PRIMARY CARE!
aetna
Medicare
Humana
United Healthcare
Cigna
BlueCross BlueShield
512-400-4025
1000 GATTIS SCHOOL RD SUITE 440 ROUNDROCK TX 78664
Email - care@primefamilycare.com | Web - www.primefamilycare.com

# হাইটেক ঘটকালি

## কেকা বসু দেব

সেই পুরাকালে, যে বছর আমি হাফ সাবালক হলাম, মানে - চাকরি পেলাম, ওমনি গার্জেনদের মনে হল, এবার মেয়েকে ফুল সাবালক করা দরকার। অর্থাৎ, একটি বিয়ে না দিলেই নয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সেই সময়টায়, আনন্দবাজারের পাত্র চাই-পাত্রী চাই কলাম যখন রবিবাসরীয় উপচে নিজেদের জন্য একটা মোটাসোটা সাপ্লিমেন্টারি আদায় করে ফেলেছে, অন্তর্জালেও ম্যাট্রিমনি সাইট খুলে গেছে বেশ কটি; শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তখন কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সম্বন্ধের বিয়ে ব্যস্তানুপাতে কমে এসেছে। বন্ধু-বান্ধবদের প্রায় সবারই স্টেডি মনের মানুষ আছে। এমনকি গুটিকয়েক জুটি, যাদের পারস্পরিক টান হাঁপানির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তারা বিয়ের পিঁড়িতে পর্যন্ত বসে পড়েছে।
আমার ঠাকুমা অর্থাৎ দিদি আর দিদিমা অর্থাৎ দিদিভাই দুজনেই সাংঘাতিক মডার্ন। সরাসরি জানতে চাইল, 'বয়ফ্রেন্ড আছে? আলাপ করা।'
ঘটঘট করে ডাইনে বাঁয়ে খানিক মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ, নেই। দেখে এমন একটা লুক দিল, যার মানে - অপদার্থ!
দিদিভাই আবার আমার মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও চিন্তিত হয়ে পড়ল।
ঠোঁটের ডগায় উত্তর রেডি ছিল, 'আমার মানসিক স্বাস্থ্য একেবারে চাঙ্গা। ইচ্ছে ছিল যথেষ্ট, স্তাবকেরও অভাব ছিলনা; কিন্তু তোমার কন্যার মোগলাই মেজাজের জন্য সব বাছুরে প্রেম আঁতুড়েই খতম হয়ে গেছে।'
কিন্তু বললাম না। সত্যি কথা কজনই বা সহ্য করতে পারে?
দিদিভাই আবার হল গে আল্ট্রা মডার্ন। বিয়ের উশখুশানি শুরু হওয়া মাত্র এক ঘটক জোগাড় করে ফেলল। মা মুখ বাঁকাল, 'আজকাল কেউ ঘটক লাগায়?'
আমার দুই মামী শুনে হা হা করে উঠলো, 'এ ঘটক সে ঘটক নয় গো দিদি! একেবারে হাইটেক।'

মামাদের ক্লাবের এক জুনিয়র মেম্বার - তীর্থঙ্কর অর্থনীতি নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট হওয়ার পর চাকরিতে না ঢুকে ঘটকগিরির ব্যবসা খুলে বসেছে; তবে একটু টুইস্ট সহ। রেজিস্টার্ড সংস্থা, নাম 'দুষ্টু প্রজাপতি।'
সারা সপ্তাহ বিন্দাস থাকে, কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে রবিবার রাত - পাড়ার গলিগুলো ভর্তি হয়ে যায় তরুণ-তরুণী বহনকারী নানা সাইজের গাড়িতে। সবাই নাকি ক্লায়েন্ট। ম্যাচ মেকিংয়ে সংস্থার স্ট্রাইক রেট একশোয় একশো। আজ অব্দি কাউকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়নি। তাই রেটও চড়া। বছর তিনেক হল স্টার্টআপটি শুরু করেছে, অলরেডি হেব্বি পশার। এজমালি বাড়ি ছেড়ে সম্প্রতি বাবা-মাকে নিয়ে প্রাসাদোপম বাড়ি করে উঠে এসেছে আমার মামাবাড়ির নাকের ডগায়। সে বাড়ির ছিরিছাঁদই আলাদা। একতলা দোতলা মিলিয়ে অনেক ঘর, কাচের জানালায় মোটা পর্দা। বাতাসের সে পর্দা নড়ে গেলে মামীরা উঁকিঝুঁকি মেরে যা দেখেছে, তাতে চক্ষুস্থির। সে কী ডেকরেশন! ছাদের ওপর নিভৃত সব শ্বেতপাথরের বেঞ্চি। পেছনের বাগানে খেলনা পাহাড়, চিনে বাঁশের ঝার ফার দিয়ে সাংঘাতিক রকম ল্যান্ডস্কেপ করা। উইক এন্ডের সন্ধ্যাগুলোতে সেই সব ঘর, ছাদ, বাগান মায়াবী মৃদু আলোতে সাজানো হয়, ঘরে ঘরে নরম মিউজিক বাজে, নিত্যনতুন যুগলেরা নিভৃতে বসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করে...
কি হয় সেখানে, তা পাড়ার কেউ জানেনা। শিয়ালদা নর্থের অন্তত পনেরোটি স্টেশনে তার ক্লায়েন্ট থাকলেও তীর্থমামা কোনোদিন নিজের পাড়ায় কোনো সম্বন্ধ করেনি।

প্রচুর চাপ। তাই বেশ কয়েক মাস আগে নাম রেজিস্টার করতে হয়। কিন্তু দিদিভাইয়ের কোনো ফরম্যালিটিস লাগল না। একে তো তাকে পাড়ার সবাই খুব ভালবাসে, তায় তীর্থমামা ছোট থেকে আমায় অতীব স্নেহ করে। তাই সাগ্রহে বলল, 'সামনের উইকএন্ডেই নিয়ে এস। চমৎকার পাত্র জোগাড় করে রাখব।'
নিয়মাবলীর একটা কাগজও ধরিয়ে দিয়ে গেল। মামীরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেজায় আধুনিক কনসেপ্ট। গতানুগতিক ভাবে এক ঘর গোলগোল চোখের সামনে বসে ঘামতে হবে না। প্রথমে দুই বাড়ির গার্জেনদের সিটিং হবে, সেখানে মতের মিল হলে পাত্র, পাত্রী নিজেরা আলাদা দেখা করবে। মূলত তাদের জন্যই নাকি অত সব মনোরম আয়োজন। গুরুজনদের দ্বারা টিপেটুপে, ওজন করে পাত্রপাত্রী বাছাই সেকেলে ব্যাপার।
বাবা-কাকা-মামা-দাদুরা ব্যাপারটা নিয়ে বেজায় নাক সিঁটকাল, থাকতেই চাইল না ওই সার্কাসে। তবে বোধহয় অভিনবত্বের জন্যই মা মেয়েকে বগলদাবা করে এক শনিবার তার বাপের বাড়ি গিয়ে উঠল।
আমার মনোভাবটাও এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি। কাজের জন্য খানিক কর্পোরেট ল ঘাঁটতে হয়েছে অলরেডি। সেখানে পড়েছি, ভারতীয় চুক্তি আইন অনুসারে বিয়ে হল দুটি সুস্থসবল স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে ঘটা এক চুক্তি মাত্র। তাই প্রোডাক্ট ঘরে তোলার আগে একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ কি? সম্বন্ধের বিয়েতে পাত্র,পাত্রী উভয়কে

ই নিক্তিতে তোলা হয়। পাত্রীর রূপগুনের যেমন অডিট করা হয়, পাত্রের পকেটও তেমন টিপেটুপে দেখা হয়। যদি ইনসাল্ট বল, তবে সেটা রেসিপ্রোকাল।

তীর্থমামা শুনলাম আমার জন্য দুজন পাত্র বেছে রেখেছে; ছবিও দিয়ে দিয়েছে ছোটমামাকে। একজন ইঞ্জিনিয়ার, আর অন্য জন, সবাই বলল, রাজজোটক হবে, কারণ সেও পাত্রীর মতই কেমিস্ট। তবে কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থায়। একটি সিটিং দুপুরে, আর একটি সন্ধ্যায়। প্রথমে মা, দিদিভাই, মামীরা গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারসাহেবের গার্জেনদের সঙ্গে দেখা করে এল। গতানুগতিক পরিবার, আপত্তির কিছু নেই। এবার তীর্থমামা আমায় নিয়ে গেল। মামীরা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ, তারাও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দুষ্টু প্রজাপতি পলিসির সঙ্গে কখনো কম্প্রোমাইজ করেনা। অগত্যা...
একটি মনোরম ঘরে পাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল হাইটেক ম্যাচ মেকার। বেরোনোর সময় বলে গেল 'নিজেদের সম্বন্ধে যা জানার জেনে নাও।'
দিনের বেলা, তাই কোনো লাইটিংয়ের ব্যাপার নেই, জানালার পর্দা টানা, ঘরের কোণের একটা অ্যাকুয়ারিয়াম থেকে মায়াবী আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বেশ নাটকীয় ব্যাপার। এটা ঊনবিংশ শতক নয়, আর আমিও কিছু অসূর্যম্পশ্যা নই; তাই বেশ প্যাটপেটিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দেখলাম খানিক। তিনিই বরং জড়সড় হয়ে চোখ নামিয়ে বসে রইলেন। মানুষটা আমার থেকে বেশ খানিকটা বড়। সেজেগুজে এসেছেন, ভুরভুর করছে আফটার শেভের সুগন্ধ। মাথায় টাক আছে, তবে সেটা বেশ কুশলতার সঙ্গে কানের ওপাশের চুল ফেরতা দিয়ে আঁচড়ে ম্যানেজ দিয়েছেন। ঠিক আমাদের সিনিয়র ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্ট সমীরবাবুর মত। উনিও ঠিক ওইভাবেই টাক ঢাকেন। একদিন অঝোর বৃষ্টির মধ্যে কানের পাশের লম্বা লম্বা চুল যথাস্থানে ফিরে গিয়ে যা তা কাণ্ড হয়েছিল। ভদ্রলোকের টাক দেখা গেলে হয়ত কিছুই হত না, আমাদের বংশে অনেকেই এমন অকাল টাকের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু সেটা লুকোনোর সমীরীয় প্রচেষ্টা দেখে বেদম হাসি পেয়ে গেল। প্রায় পিছন ফিরে মাছের চৌবাচ্চার দিকে চেয়ে থাকলাম। হঠাৎ মৃদু মোলায়েম গলা পাওয়া গেল, 'কি ভাবছেন?'
'কি ভাবছি?' ব্যোমকে গিয়ে বেকুবের মত তাকাই। মাথা কাজ করার আগেই স্মার্ট জিভ ফস করে ওঠে, 'ইন্দ্রলুপ্তের কথা।'
'সে আবার কে?' পাত্রের ভাবালু চোখ জোড়া সহসা ইশকুলের বেঘো অঙ্ক টিচার ভারতীদির আকার ধারণ করে। থতমত খেয়ে বলি, 'মাথার টাক। ওটার ভালো নাম ইন্দ্রলুপ্ত।'
বুঝতেই পারছেন, এরপর নিভৃত আলাপ ঘেঁটে ঘ।
ভদ্রলোক বোধহয় কিছু কমপ্লেন করেছিলেন। তীর্থমামা গোমড়া মুখে বলল, 'বিকেলে আর আলাদা বসার দরকার নেই। পাত্র-পাত্রী ফ্যামিলির সঙ্গে একসঙ্গে বসবে।'

সন্ধ্যেবেলা তীর্থমামার মা, শুক্লাদিদার নেতৃত্বে তাদের বৈঠকখানায় দুই কেমিস্ট পরিবারের তুমুল আড্ডা জমল। সাধারণত ছেলের ব্যবসার ব্যাপারে শুক্লাদিদা নাক গলায় না, কিন্তু ছোট থেকে আমায় বড্ড ভালোবাসে। তাই পাত্রীপক্ষকে লিড করছে। পাত্রের মা রেলের চাকুরে, আর খুব গোপ্পে মানুষ। ঢাকাই অ্যাকসেন্টে নাকে চোখে মুখে কথা বলেন। পাত্র এককোণে বসে আছে, এমন ঘাড় গুঁজে, যে কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথার তালুটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে। গল্পের তুঙ্গ মুহূর্ত, ভদ্রমহিলা কাশীর গলি দিয়ে রিকশায় চেপে চলেছেন, একটি কেঁদো ষাঁড় এসে মারল এক গুঁতো। এরপরের অংশটুকু তাঁর অনুকরণীয় ভঙ্গিতেই শুনুন, 'ষাঁড় এমন গুঁতা মারল, পুরা ছিটকাইয়া পড়লাম, আর ওমনি হাইগ্যা মুইত্যা ফ্যাল্লাম।'
কথাটা শোনা মাত্র বড়মামীর দিকে চোখ গেল, দেখি হাসি চাপতে গিয়ে মুখ লাল। ছোটমামীরও সেম দশা। তীর্থমামার মা এবারেও লিড দিল, বিকট রকম হেসে উঠল, 'হাঃ হাঃ হাঃ! হাইগ্যা মুইত্যা! ওরে বাবারে! পেট ফেটে গেল রে!'
তার দেখাদেখি আমি, আর তারপর পুরো কন্যাপক্ষ। রাশভারী ছোটমামী তো সোফা থেকে নিচে উল্টে পড়ল। যথারীতি এবারও সব চটকে চ। মায়ের ভাষা নিয়ে ব্যঙ্গ করায় পাত্র ব্যাপক চটেছে। তীর্থমামা তার মায়ের ওপর আছড়ে পড়ল, 'এত বয়স হয়েছে, নিজেকে চেক করতে পার না?'
'তোর ক্লায়েন্টের মা নিজের জিভকে চেক করতে পারে না?' শুক্লাদিদা অনমনীয়, 'লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি বাকরি করছে, কোথায় কি বলতে হয় জানে না? ওর ছেলের জীবনেও বিয়ে হবে না।'
মোট কথা, দু দুটো সম্বন্ধ ভেস্তে দিয়ে হিহি করে হাসতে হাসতে সদলবলে বাড়িমুখো হলাম। শুধু মায়ের মুখ অপ্রসন্ন। তিনি আজও বলেন, আমি নাকি স্রেফ রগড় দেখার জন্যই তীর্থমামাদের বাড়ি যেতে রাজি হয়েছিলাম। নইলে অত সুবোধ নাকি নই।
তাতে অবশ্য কিছুই এসে যায়নি। যথা কালে আনন্দবাজারের চক্রান্তে আমার বিয়ে হয়েছে। আর তীর্থমামার অত ভালো স্টার্ট আপটাও উঠে গেছে বছর দুয়েকের মধ্যেই। বাঙালির চিরন্তন 'বউয়ের মর্জি'তে। সে বছরই দুষ্টু প্রজাপতির প্ররোচনায় তীর্থমামা দুম করে তার এক ক্লায়েন্টের প্রেমে পড়ে গেল। বিয়েও করে ফেলল পাত্রীর অন্য একটি পাকা সম্বন্ধ কাঁচিয়ে। সেই নতুন মামী রিস্ক নিতে রাজি নয়। যে ব্যবসায়ী অন্য ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট আত্মসাৎ করে, তাকে কি বিশ্বাস করা যায়?

# অপূর্ব স্পর্শ

## শান্তি কুমার ব্যানার্জী

শাকুব, তার বাবা ও মায়ের প্রথম জীবিত সন্তান। তার জন্মানোর একবছর পূর্বে তার দিদি, মুকুল, ছয় মাসের বয়সে, একরাতের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বছরটি ছিল ১৯৪৬। দিদি পরাধীন ভারতে জন্মে ছিল ও স্বাধীনতার পূর্বেই মৃত্যু হয়।

শাকুব বড় হয়। তার আরও দুই বোন ও দুই ভাই হয়। স্কুল ও কলেজের এর শিক্ষা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারী কার্যালয়ে গোয়েন্দা বিভাগে যোগদান করে।সে কখনও চিন্তা করে নি তার এরকম একটা গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি হবে ও দুঃসাহসিক কার্য করতে উন্মুখ থাকতে হবে। সে সকলতো অনেক গোপনীয় কথা, যা উল্লেখ করা যায় কি?

চাকুরী তে যোগদান করে নিয়ম অনুযায় শাকুবকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করতে হয়। সেনা, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর যৌথ অনুশীলনে গঠিত সেই কষ্টকর প্রশিক্ষণপর্ব ছিল শারীরিক সক্ষমতার প্রকৃত পরীক্ষা। তাকে শুধু কঠিন বলা আসলে তার কঠোরতাকে ছোট করে দেখা। প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করার পর তার প্রথম posting ছিল Gangtok। পাহাড়ি রাজ্য Sikkim এর রাজধানী Gangtok। ১৮৪০-এর দশকে একটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই শহরটি ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রের রাজধানী হয়েছিল, তবে ১৯৭৫ সালে এটি ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। শাকুব ঠিক তার তিন বছর পর সেই মাটিতে পা রাখে।

শাকুব সমভূমির ছেলে। সেই সময় Sikkim এর অন্নরকম পরিবেশ তাকে বেশ আকর্ষণ করে। পাহাড়ি ভূগোল প্রধান, আর সংস্কৃতিতে তিব্বত ও নেপালের মতো হিমালয়ের প্রতিবেশীদের প্রভাব স্পষ্ট। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ঐতিহ্যও এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অন্য অংশে যেখানে রাজ্যগুলো মূলত ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে সিকিমের পরিচয় গড়ে উঠেছে তার জাতিগত ও জনজাতির ইতিহাস থেকে। এই পরিচয় ফুটে ওঠে তাদের অনন্য ভাষা, উৎসব আর খাদ্যসংকৃতির মাধ্যমে ।

Gangtok থেকে শাকুবকে সিক্কিমের অন্যআন্য জায়গায় কাজের জন্যে যেতে হতো। এরম এই একটা posting এ শাকুব উত্তর সিকিমের Chungthang এ এক বছরের জন্যে অবস্থিত হয়।

সালটা ছিল ১৯৭৮। Chungthang এ Lachen chu ও Lachung chu দুই পর্বতের ছোট জলপ্রবাহ মিলিত হয়। সেইসময় সেখানকার অধিবাসীরা নদীর পাশের পাথর ভাঙার কাজ করত । Lachen chu এর উপর ছোট একটা সেতু বানিয়ে নদীর ওপার থেকে পাথর ভেঙে এপারে ঐ সেতু উপর দিয়ে আসা যাওয়া করত। সমতলের সন্তান শাকুব সবসময় বিস্মিত হতো পাহাড়ের কঠিন জীবনের প্রতি, আর তার হৃদয় ভরে থাকত তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়, যারা সেই জীবন সহ্য করত। শাকুবের ওখানে থাকা কালীন একদিন ঘটে গেলো এক হৃদয়বিদারক ঘটনা।

একদিন ঐ সেতুর উপর দিয়ে আসার সময় এক স্থানীয় যুবক শ্রমিক সেতু থেকে Lachen chu এ পড়ে যায়। অত্যন্ত ঠান্ডা জল এর খরস্রোতা নদী থাকাতে ও আর উঠতে পারিনি, মারা যায়। তার দেহ তখন ভাসতে ভাসতে Chungthang এর সেতুর নিচে পাথরে আটকে যায়। অধিবাসীরা ওপর থেকে দড়ি দিয়ে নিচে নেমে ওর মৃত শরীরকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা সফল হয় নি। দড়ি মৃতদেহের কাছে যাবার পূর্বে দেহটি ওখান থেকে নদীর স্রোতে ভেসে যায়। শাকুব কিন্তু এই সমস্ত সেতুর উপর থেকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল। সেতুর উপর থেকে দাঁড়িয়ে শাকুব চিন্তা করে যে এই নদী তাদের অফিসের কাছে সমতল জায়গা দিয়ে কিছুটা বয়ে যায়। তার মনে হয় যদি সে ওই জায়গা তা সময়ে পৌঁছতে পারে তাহলে ওখানে কিছু করার সুযোগ আসতে পারে।

শাকুব অফিসের দিকে ছুটতে শুরু করে। সে জানে এই নদী কিছু রাস্তা একিয়ে বেঁকিয়ে তবে সমতল স্থানে পৌঁছবে। শাকুব দৌড়াল তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজের সবটুকু দিয়ে দেহটিকে চোখের আড়াল না হতে দেওয়া। পাহাড়ি নদী প্রচণ্ড বেগে ছুটছিল, আর সেই খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদীর ধারা

অনুসরণ করা মোটেও সহজ ছিল না — তবু সে থামেনি। যখন সে সমতল স্থানে পৌছালো তখন সে দেখলো কিছু দূরে মৃত শরীরটি ভেসে আসছে। দেহটি কাছে আসতে নিজের সাহসিকতার সর্বোপরি মানবিকতার খাতিরে সেই বরফ জলের নদীতে নেমে মৃত শরীরের মাথার চুল ধরে টেনে নদীর পাড়ে নিয়ে আসে। মৃত ছেলেটির পরিবারের আত্মীয়রা, ওখানকার মানুষ ও office কর্মীরা খুশি হয় যে মৃত দেহটি উদ্ধার হল। মৃত ছেলেটির পরিবার অত দুঃখের মধ্যেও শাকুবকে বলে - 'আপনি লামার ( ওদের ভাষায় সাধু) মত কাজ করেছেন। আপনার জন্যে দেহটি উদ্ধার হল।' এর পরেই নাকি নদী অতি নিম্ন প্রভাবিত হয়ে জঙ্গলের উপত্যকায় প্রবেশ করলে মৃত দেহের উদ্ধার খুবই কষ্টসাধ্য হত, বা হয়তো দেহটি আর উদ্ধার করা যেত না। ছেলেটির পরিবারের লোকেরা শাকুবকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো - সেটা ছিল অদ্ভুত ঈশ্বরীয় আনন্দ। যাহা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পরেছিল যার বর্ণনা করা যায় না। সে এক অকল্পনীয় অনুভূতি।

সালটা ছিল ১৯৯৮। শাকুবের বেশ ২০ বছরের ওপর চাকুরী হয়ে গেছে। শাকুব সংগীত প্রেমী। সেই সময় Sony র Music System বাজারে নতুন এসেছে আর শাকুব খুব শখ করে সেটা কেনে। এই Music System টাই recording এর বেশ ভালো ব্যবস্থা ছিল। শাকুবের মা ও বাবা সেই সময় ওর কাছে বেড়াতে আসে। এই সুযোগে শাকুব নিজের বাবা ও মায়ের একটা কথপোকথন রেকর্ডিং করে। তখন শাকুবের বাবার তাঁর মৃত কন্যার কথা মনে পরে যায় । সেইসময়ের বাবা ও মায়ের শোকবিহ্বল মুখমন্ডল শাকুবের মনে গেঁথে আছে। মৃত্যু মানব জীবনের একটা অবিচ্ছেদ অংশ থাকা সত্ত্বেও সে ওটা মেনে নিতে পারে না। সেইদিন তার বাবা ও মায়ের শোকাচ্ছন্ন চেহারা শাকুবকে সেই মৃত ছেলেটির পরিবারের কথা মনে পরিয়ে দেয়। শাকুব যদিও তার দিদিকে দেখে নি, তবে সেদিন তার মা ও বাবার করুন চেহারা দেখে তার অন্তর সেই না পাওয়া দিদি র জন্যে গভীর শোকে ভরে ওঠে ।

এখন শাকুব সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। সাংসারিক নানা চিন্তাই মগ্ন থাকে। তবুও সেই উপলব্ধি মাঝে মধ্যে অনুভব হয় - তার ডান হাতের মুঠোয় মৃত ব্যক্তির মাথার চুলের সেই স্পর্শ - ভয়ঙ্কর, তবু তৃপ্তিদায়ক। কারণ সেই স্পর্শই তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, শাকুব মৃতদেহটি পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল - এক অপূর্ব অনুভূতি।

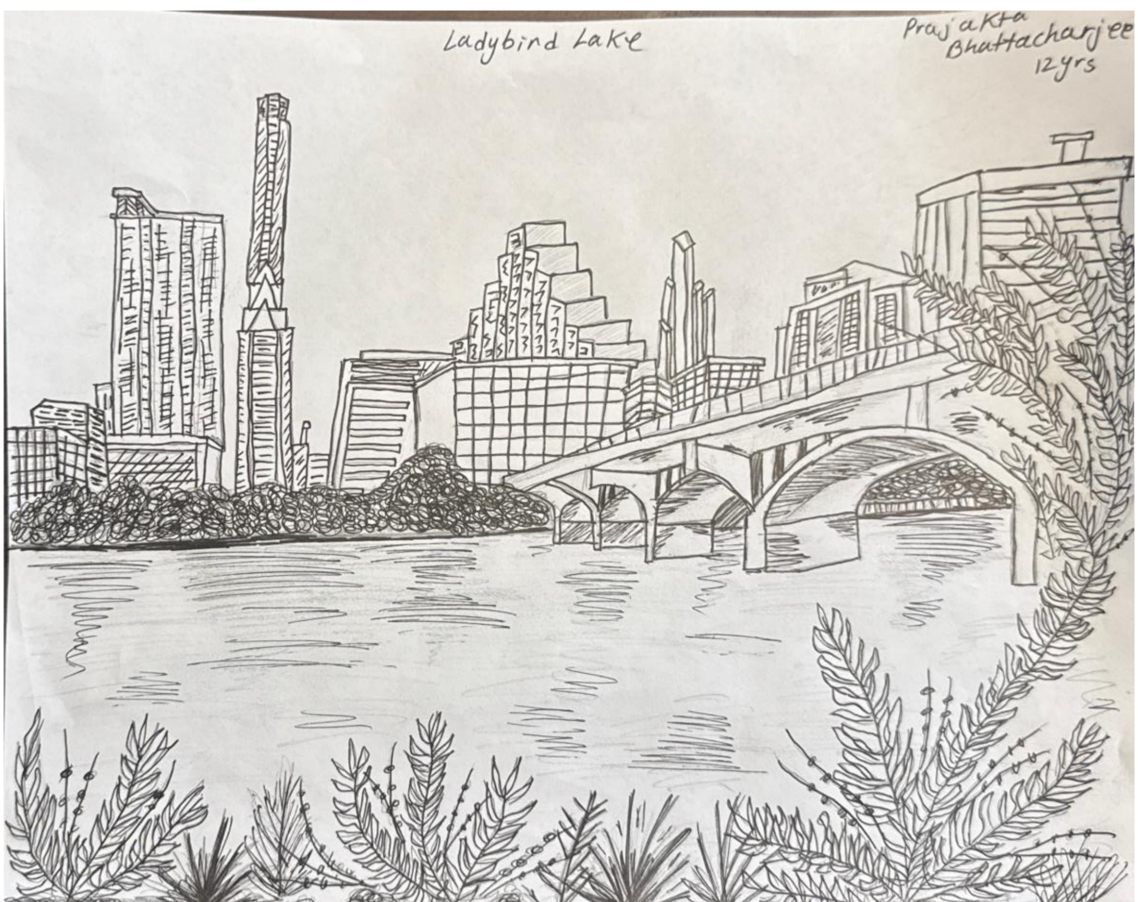


*Ladybird Lake – Prajkta Bhattacharjee (12)*

# ফানুস

প্রবাল দাশগুপ্ত

আশার ফানুস আসমানেতে
উড়িয়ে দিলেম জোরে,
চড়বো তাতে যাবো দূরে
ওই ফানুসে চড়ে।
মনের আলো জ্বালবো সেথা
আঁধার রাতের দেশে,
চাঁদ তারাদের মাঝে যেথা
আকাশ এসে মেশে।
ফানুস আমার গোপন মনে
যাচ্ছে দিয়ে উঁকি,
আকাশে আজ দিলাম পারি
আঁকতে আঁকি বুকি।
সাতরঙা ওই রামধনু যায়
আকাশ চিরে যেথা,
আমার ফানুস স্পর্শ করে
সব কটি রং সেথা।
মেঘের পরে নীল নীলিমায়
দিগন্ত অসীম,
ফানুষেতে ভেসে দেখি
ফেলে আসা দিন।
কত কড়ি জমাই পুঁজি
ভরেনা আর মন,
আসমানেতে ভাসিয়ে দিলেম
ফানুস আমার মন।।

# নকশি কাঁথা জীবন গাঁথা

প্রবাল দাশগুপ্ত

নকশি কাঁথায় টানা যে দাগ
আঁকা বাঁকা রেখা,
জীবন জুড়ে হিসাব নিকেশ
ক্ষণিক খুঁজে দেখা।
নকশি কাঁথার ভাঁজের ভিতর
গন্ধ খুঁজে ফেরা,
ফেলে আসা দিনের পানে
শুধু চেয়ে থাকা।
অনেক ফাগুন গেলো ফিরে
রইলো কিছু বাকি,
কথার মালা ঝুলিয়ে শুধু
নিজেকে দিই ফাঁকি।
চিনবো ভাবি সকলকে আর
হয়না সঠিক জানা,
নিজেকে আর চিনবো কবে
মেলবো কবে ডানা।
আমার আমি শেষের পাতায়
প্রশ্ন করে মোরে,
ঘোর কি আজই ভাঙ্গলো রে তোর
যাত্রা শেষের ভোরে?

# মায়া ও মহামায়া

দেবস্মিতা পাল চ্যাটার্জী

ঝন ঝন করে ভীষণ আওয়াজ, সম্বিৎ ফিরে পাই
বন বন করে ঘুরছে মাথা। ছিলাম অলিক দুনিয়ায়।
বড় ব্যস্ত ছিলাম আমি, সময় আমার ভীষণ দামি—
বিশেষ করে এই সময়টা, কোন ফুরসুৎ নাই।

আগল খোলা কপাট আমার, নিশ্চছেদ্ সন্ধান
আলমারির গুপ্তধনে বিজয় অভিযান।
থমকে গিয়ে চমকে উঠি, রইল না বুঝি ঘটি বাটি,
বাসন মাজায় লিপ্ত স্বামিতে, হল বড্ড অভিমান।

একটুকু তো সময় করেছি বরাদ্দ নিজ খাতে
তার পরেতেই ছুটতে হবে হেঁশেল, মাছে, ভাতে।
শাড়ি গয়না প্রবল ধাঁধা, ঘটকালিতে পড়লো বাধা
পুজোর সাজটা এইবেলা হায় জুটল না আর পাতে।

দুরাভাষে ব্যাস্ত ছিলাম, তুমুল আলোচনা।
দু বান্ধবি বেজায় নিষ্ঠ, শারদ্ গবেষণা,
নেই আস্থা আপন মেধায়, চিন্তিত আছি, আছি দ্বিধায়
নারী কুলে হতেই হবে সুবেশ ও ভূষণা।

এমন সময় মা মা রব গগন ভেদী ডাকে,
কর্ণ বিদারী, জরুরী তলব, -মেয়ের তখনি চাই মাকে।
শান্তি নেই একটু আমার, শত সমনে আমি জেরবার।
কি বিপদ! ছুটলাম জোর, চর্চা উঠল তাকে।

না, নাহ্! এবারও হলনা এই কাজের নিষ্পত্তি,
এবছর বুঝি পুজোর দিনে বাড়বেনা প্রতিপত্তি
আপজনে শত্রু হলে, বিধি বাম রুখি কি কৌশলে!
এবার তবে পরেই রবে আয়োজিত সম্পত্তি।

সারা বছর অপেক্ষা এক, দুগ্গা আসবে কবে
শিকেয় উঠুক কাজ কারবার, আমি নিয়োজিত উৎসবে।
যতই কিনি কমই ঠেকে, বাজার দরও বাঁকা চোখে দেখে!
স্বপ্ন বিম্ব আয়নাতে আর দেখবনা আমি তবে!

মনের কোনে অপরাধ বোধ, আমি কাটাবো আশক্তি
শাড়ি গয়না মোহ মায়া, দাম নেই একরত্তি
পতি জানায় আপত্তি ক্ষীণ, ভারি বয়ে গেল, ভাবলেশহীন।
এ মায়াজাল কাটাতে আমি পাইনা খুঁজে যুক্তি।

যাহোক এবার যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় প্রস্তুত।
গুছিয়ে ওঠা হলনা তেমন, তাই মন করছে ক্ষুত ক্ষুত।
তবুও কেমন খুশির হাওয়া, ছোট্ট ছোট্ট চাওয়া পাওয়া,
কোঁচরে ভরে তৈরি আমি, আবাহনে উন্মুখ।

*Waderam Desert Jordan - Rumku Chowdhury*

# নুতন- পুরাতন
পাপিয়া দাশগুপ্ত

নতুন বছর নিয়ে আসে নতুন দিনের আশা,
পুরাতন যে বছর ছিলো শুধুই সর্বনাশা
যে কোহিনূর হারিয়ে গেলো তাকে যে না পাই,
হন্নে হয়ে খুঁজি তাকে, মেলে না যে ঠাঁই।
হারিয়ে যাবার দুঃখে শোকে ব্যাথার বোঝা নিয়ে বুকে,
কাটিয়ে দেব বাকি জীবন যতদিন না ডাকে মরণ।
নতুন বছর নতুন আশা, রইবে নীরব ভালোবাসা ,
আশার আলো যেন দেখি, তোর জীবনের মাঝে,
ভালো থাকিস সুস্থ থাকিস সকল কাজের মাঝে।
আর যেন না উল্কা পতন,
হয়না কভু যখন তখন।

# আমার জবা
পাপিয়া দাশগুপ্ত

গ্রীষ্ম কালের দুপুর রোদে, দমকা হওয়ার ফাঁকে ,
আমার সোনা জবা হয়ে খিড়কিতে চোখ পাতে।
বলে মাগো কেমন আছো! কেঁদোনাকো মোটে ,
মুখের আদল ফুলের মতো, টুকটুকে লাল ঠোঁটে।
মুচকি হেসে হেলে দুলে, হাতছানিতে মন ভুলিয়ে ,
হঠাৎ যেন মনের কোনে দোলা দিয়ে যায়গো চলে।
আমি থাকি আশার চোখে, আমার জবার দিকে।
আবার কবে আসবে খোকা, টুকটুকে লাল ঠোঁটে !

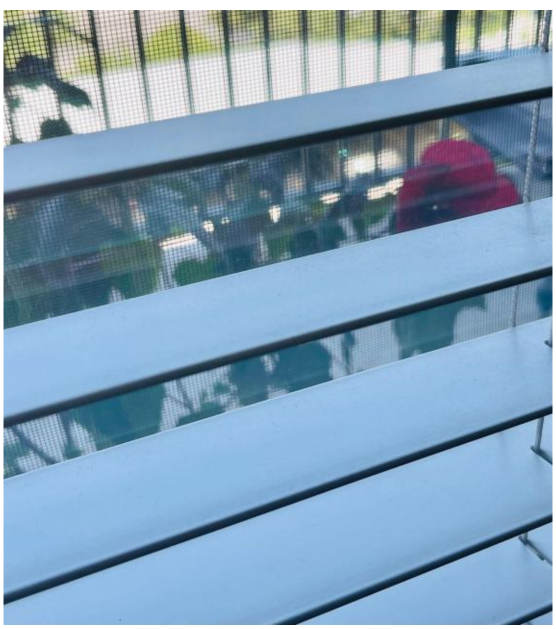

# Solitude
Aruneet Dasgupta

They fear the silence
I welcome it like kin.
In the absence of noise,
I hear where I begin.

No crowd to chase, no praise to earn,
Just the echo of thoughts I let quietly burn.
Solitude's not exile it's a forge.
Where I temper my soul,
Where illusions dislodge.

I don't seek the world when I feel alone,
I seek the mirror the mind I own.
For peace isn't found in applause or fame,
It's found in knowing you'd still stand
without a name.

See
Man isn't made in the noise of the fight,
He's shaped in the hush
before the strike.
In stillness, I measure my worth,
Not by what I possess,
But by what I'm willing to unearth.

The world teaches you to fill every space,
But the gods?
They speak in silence and grace.
A man who can sit with his thoughts, unshaken
Is a man who'll never be easily taken.

I don't need company to feel complete.
I walk alone, yet never in defeat.
For solitude is not a prison or chain,
It's the throne where I reign
within my own domain.

So if you see me distant,
Don't confuse it with retreat
I'm not hiding…
I'm building where none compete.

And when I return, I return whole
Not needing the world,
But ready to hold it in control.

# একলা পথে

দেবযানী দাশগুপ্ত

চলে গেলি নিঃশব্দ অভিমানে
ঢাকা ছিলি শীতল আবরণে,
যাবার সময় কেউ ছিলোনা পাশে
সঙ্গবিহীন শেষের সে নিঃশ্বাসে।
জীবন ছিল শুধুই ভেসে চলার
ঠাঁই হয়নি কোথাও নোঙর ফেলার,
ব্যস্ত সবাই আপন কক্ষপথে
কেটেছে দিন দীর্ঘ অপেক্ষাতে।
অশ্রু ছিল হাসির অন্তরালে
জীবন বাঁধা একাকিত্বের জালে,
অবুঝ তুই ছিলি সবার চোখে
বারে বারে আঘাত দিয়েছে তোকে।
লাঞ্ছনা আর অপমান পারেনি ক্ষুদ্র করতে
ভালোবেসেছিলি সকলকে বিনা শর্তে,
কোথায় পেলি জীবন বোধের দীক্ষা
এমন করে ভালোবাসার শিক্ষা ?
সবাই ছিল, তবু যেন কেউ ছিলোনা সাথে
হাতটি ধরার অন্তবিহীন রাতে,
তাই বুঝি ফিরে গেলি সব রেখে
একরাশ প্রশ্নচিহ্ন এঁকে।
যেথায় গেছিস জানি ভালোই থাকবি
আঁধার ছেড়ে আলোর পথে হাটবি,
সেথায় থাকেন ত্রিভুবনের স্বামী
তার কাছে যে সবাই সমান দামি ।।

# Oh Banff

Ishaan Sengupta (12)

May the breeze be flowing through the mountains.
May the mighty glaciers carve through the rocks.

As the Bow River bends as a masterpiece.
As the fog settles down on the trees above.
As the ice caps melt, feeding the beauty.
Nature embraces every mountainside.

The blanket of nature's love paves the way.
The mighty valley proving its place.

Banff and Jasper, how lucky you might be.
The vast lakes, being the haven of life.
Triplets of nature's cosmetology.

As the cold winter weather settles in.
A blanket of snow covers the valley.
Oh Banff, what a wonder you are to see!

# PEI & NOVA SCOTIA, Canada

Rupa Mukherjee

Pictures that will linger in my mind ……..

Each corner of the countryside breathtaking & hand painted.
Warm & cooler colors in a perfect poise
well blended !

The blue skies makes you ponder & revere.
The windmills musically sing in the air.
As the clouds play hide & seek with the sun ,
Suddenly the blazing sun sinks into the deep Atlantic ocean .

Watching this magical moment with ecstasy !
So stunning , surreal & possibly divine fantasy !!

The lush green meadows of wildflowers & green,
Nature's bliss , it's truly serene.
They greet us so generously everyday!
Pastures of potatoes & corn fields,
Red granaries overflowing with grain & hay.

The Canadian geese artistically glide above the ground ,
Elegance enduring , Silence profoundly makes a meaningful sound.
The Big Bald eagle magically soars into the sky.
Watching the seals & otters wade in joy !
The Seagulls with their mouthful of crunchy crabs create a cacophony,
Such varied murmurs in Nature is a memorable symphony !

As the fisherman await  with a patient heart ,
Countless hours of reflection & resilience on their part !!

Beautiful homes tucked away in a meandering pathway,
Colorful hollyhocks & hydrangeas galore along the way!

Lighthouses give a stunning view of the harbor when the blue ocean meets the horizon .
Moonlit  beaches peacefully play a melodious music,
As the waves slowly swell & swing by the ocean!

Nature's beauty is truly enriching!!
How lucky I am to hold memories so fascinating.

I smile to myself & say ,
Nature certainly adds in every way
A Lust for Life  everyday !!

# Newfoundland

Shantanu Ganguly

I knew Newfoundland as a large cold and somewhat remote island off the north-east coast of Canada, with glaciers floating by, and a Viking settlement at the very tip. In 2024 while driving around in western Brittany, we came across a small church where in the 1500 AD time period, fishermen would pray before going to fish in Newfoundland. That strengthened my desire to explore this island. Early in 2025 as part of a road trip through Atlantic Canada, we spent more than two weeks in Newfoundland. The simplest way to visit is to fly into St. John, we took an overnight ferry and arrived at the SW corner of the island.

## Gros Morne National Park

The SW coast of Newfoundland was reminiscent of Cape Breton, but more rugged. In early June, some snow was still visible on distant hills. The scenery was beautiful with rugged rocky trails and bushes sculpted by the wind. We used Norris Point as a base and spent two days hiking in various spots of Gros Morne. The most popular trail here is the Tableland Trail – a rare spot where the earth's mantle has extruded into the surface. The exposed rock here is peridotite – which has very few nutrients and contains toxic minerals, so few plants manage to survive here. As we left this spot, we squeezed in a hike to a glacier carved lake and a visit to the spot where the SS Ethie was shipwrecked (everyone survived). Driving along the western coast, we reached the very tip of Newfoundland at L'Anse aux Meadows.

L'Anse Aux Meadows (pronounced Lance-a-Meadows by the locals)

This is where Leif Ericsson had landed, hugging the coastline in Viking longboats from Greenland north to Baffin Island, then south along the coast of Labrador till he and his crew reached this spot. Here the Norse set up a settlement for about 10 years, then it was abandoned for several reasons – one of which was conflict with the First Inhabitants. Norse Sagas and Innuit stories record this excursion. Our guide described the arrival of Norsemen not in the typical Eurocentric 'X discovered America' but a much more profound fashion. He said – humans left Africa and broke into two branches. One populated all of Europe, while the other spread through Asia and eventually populated North America. This is the spot, he said, where these two branches of humans met for the first time. It seems that meeting did not end on good terms.

We spent much of one morning exploring the site– only mounds exist that have been thoroughly excavated. The recreation of a Norse village complete with actors provides a sense of realism to visitors. Then we dashed off to a nearby village to catch our iceberg boat tour. Despite the fog, our captain managed to get the boat near several icebergs which we saw from all sides. Our ride on an open boat was bitterly cold. Coming back to shore, we warmed up with some coffee and headed back to the Viking site to finish seeing the exhibits. Leaving L'Anse we had overnight stop at Deer Lake to reach Fogo Island.

## Fogo Island

On the surface Fogo Island is one of many islands that dot the NE coast of Newfoundland, but there are a few things that set this island apart. First and foremost is the redevelopment spurred by one of its residents, Zita Cobb, who injected a lot of personal wealth into the island and spurred a resurgence of traditional arts and crafts including quilting and pottery. Second, Fogo Island is designated as one of the four corners of flat earth by the Flat Earth Society, oddly their corners form a triangle on a map. Third, Fogo was an early deployment of radio communication, its remote eastern location in the North Atlantic was suitable for repeating radio signals from the North Sea. The Fogo radio tower was the second to pick up the Titanic distress call.

We spent two days here hiking local trails, pottered around in pottery studios, visiting the Flat Earth and Marconi spots, and saw a large iceberg just floating in the bay – just like the photos of Iceberg Alley. From Fogo we headed south to Twilingate, another coastal town that turned out to have a similar vibe to Fogo, except larger and marginally busier.

## Twillingate

The twi in Twilingate is pronounced twee, and once we got there I understood why. This village was founded by the French and called Touilingate, and the name was anglicized after the British took over complete control of Newfoundland. Our B&B here was at the very tip of the peninsula near a lighthouse. It was raining hard as we arrived, but soon afterwards it cleared up, and we were presented with beautiful views. Later in the evening we drove to the nearby lighthouse, from where we managed to see a distant iceberg.

The next morning spent hiking in the Spillars Cove area where the trails climbed up and the views were fantastic. We saw two local museums in the afternoon – one entirely devoted to the building of fishing boats. That night we had a delightful experience at the Twillingate Dinner theater. We were served a lobster dinner, after which the entire restaurant crew performed various songs and skits for us. I was amazed at the quality of the music and later learned that most Newfoundlanders are musical, and the island is known for the music. The cast told stories about life in the area, highlighting the tough life the fishermen and their families led. We also learned details about cod fishing and the collapse of the industry (this was repeated in the remaining sections of the journey).

The following morning, we left Twillingate, stopping to see a cluster of icebergs that were currently in the area. We also stopped at the Beothuk exhibit center to learn about a tribe that had populated entire Newfoundland but went extinct after contact with the Europeans, due to a combination of disease, conflict, and loss of access to coastal food sources. The origins of the Beothuk are shrouded in mystery – and DNA analysis has just started to establish how they relate to the other settlers of this area.
Gander & Bonavista

Our last stop in Iceberg Alley was Bonavista. On the drive from Twillingate to Bonavista, the route went through Gander, where we made a brief stop. Gander is the obscure town where 38 incoming flights made an emergency landing when the US airspace was shut down abruptly after 911. Almost seven thousand people suddenly arrived at a town of ten thousand, and the locals reacted magnificently to the challenge of handling this influx. The musical Come From Away tells this story. Naturally, Gander is more than this one incident. At the dawn of passenger travel by air, Gander was a refueling stop to cross the Atlantic and developed a huge airfieldAs airplanes improved, Gander's importance waned then waxed again during WW2 as an important Allied air force base. Fun fact: Gander was a refueling stop between USSR and Cuba and a popular point of defection. Gander has a small flight museum that is absolutely worth a visit if you're driving through this area. The main reason to come to Bonavista is to see puffins up close. The first viewing spot is the Cape Bonavista Lighthouse, where puffins and other shorebirds huddle on an island across. This is also where the explorer John Cabot supposedly set foot on Newfoundland, the location is marked by a statue. Fun fact, he was a Venetian named Giovanni Caboto, funded by the English king Henry VII, hence the anglicized name. The second puffin view spot is the nearby town of Elliston, which is famous for root cellars. Root cellars are exactly what the name implies, a cellar buried underground for storing food through the winter season. They look like hobbit dwellings, except without windows and square doors.

During our two days here, besides hiking and puffin watching, we also saw two good local museums. The Ryan Premises Museum shows an excellent exhibit of life here centered around cod fishing and seal hunting. The Matthew Legacy Museum houses a replica of the ship that was sailed by John Cabot to these shores, constructed by local craftsmen for the celebration of the 500th anniversary of Cabot's landing. From Bonavista we drove to St Johns, where we caught a prop-plane to the tiny island of St Pierre.

### St Pierre & Miquelon

Last year after returning from France I heard about two islands that are still territorially part of France. During this trip through Canada, I understood why, after multiple wars with the British the French clung on to these two islands while ceding the rest of French Canada to the British. After multiple skirmishes over these two islands a treaty was signed, and now the islands have evolved into a travel curiosity. St Pierre and Miquelon are connected by a shallow sand bar, and travel between the two islands is an infrequent ferry or a charter plane. About 5000 people live in St P, and about six hundred in Miquelon.
St Pierre is a wonderful place to walk around in, it feels like the small towns in rural France we saw in 2024. There are no traffic lights, and the town can be covered on foot. Since the island was so small, we kept running into the same people on trails, restaurants etc.

St Pierre has a set of trails that start very close to our hotel and climb into the hills. We spent much of the first day hiking, having picked up sandwiches at a local deli. Towards the end of the day, we got a charming island tour by a young local who was very proud of her island. We saw the harbor with a memorial to a shipwreck where all the people were lost – apparently bodies kept washing up on shore for days later. We also saw the broken bits of another shipwreck elsewhere - wrecks seem to have been a common occurrence.
On our second day we took a boat over to L'Île-aux-Marins, a nearby island that's populated part time and was a base for cod drying. In this area, due to a lack of trees, the drying of cod is done on stones, and we saw

several such patches. In the distance was an uninhabited island that had been used for quarantines. Later in the day we saw the local museum which had rooms themed on various topics. One major display was on the nuns who volunteered to come to the island, and a second was on bootlegging. During the prohibition the island was a significant base for alcohol (primarily rum from the Caribbean and grain whiskey from Canada) that was clandestinely re-shipped in small boats to the US.

After our foray to the French territory of St Pierre, we returned to St Johns, the capital of Newfoundland. We spent three days seeing the town and surrounding coast.

# Spring in Texas!

Joyeeta Banerjee

It's 6, the body clock says
Lazy eyes half open validates!
The clock on the wall
a little beyond 7,
Oops ! Day light saving started,
Thank God it's Sunday!

Sun just started showing up
Leaves enjoying the morning breeze,
The small light green ones in full swing
just born.
Birds having early morning picnic
Medley of murmurs and chirps.

Tossing and turning
the all bed to myself,
wrapped in cotton blanket.
Closing eyes for five more minutes,
five more minutes of extra sleep;
Happiness is sleeping diagonally.

The plan is still on
A new place to explore!
Not the usual monotony
of keyboards and mouse-
the joy of newness,
sparks of excitement,
7ams Sundays are a delight!

Brown hills,
winding roads,
dessert thorns,
overcast skies,
bliss for the eyes.
Sunless days can also be bright!

Miles of walk up the rocks -
Crevices of greens
with bursts of purple and red,
water poodles!
Occasional Bluebonnets all set to steal the show
Coreopsis are my favorites.

Stories of teens,
of cousins and dreams,
friendships that lasted,
the love that was not meant to be.
Warm pink granite on my shoulders
warm grey skies to sooth
Spring is short lived in Texas
Nostalgia is bliss !

*MA Durga*
*Aarav Guha (11)*

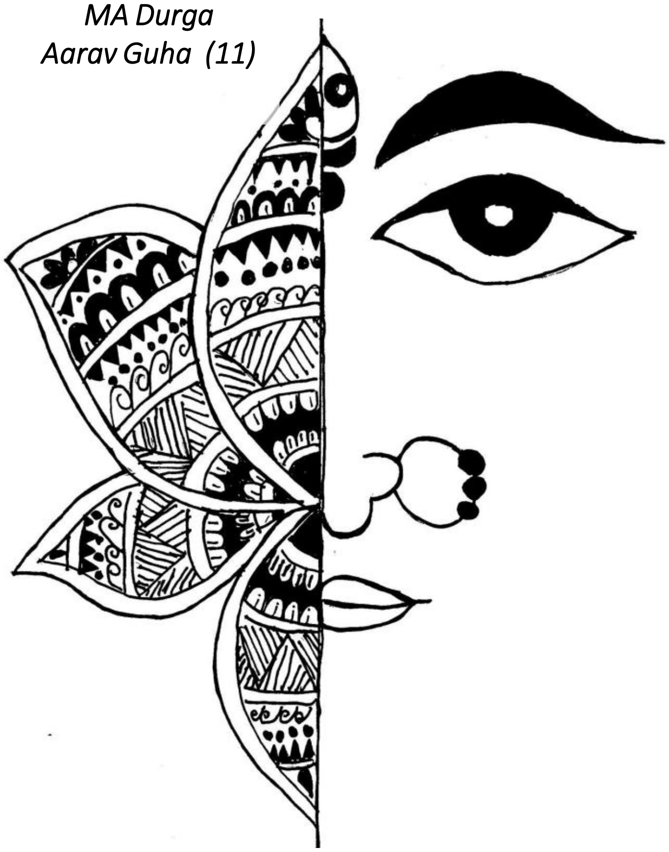

*Tesla world*
*Andreas Dutta (7)*

*Nana Rong*
*Arina Dutta (5)*

# When the Trains Stopped Chugging!

Debasree DasGupta

Across the vast expanse of paddy fields behind our house, the train tracks meandered from the Ranchi railway station all the way through to the newly established colonies at Dhurua. Each morning, as the Howrah-Ranchi Express rambled down those tracks and whistled its approach call, my mother would exclaim, “oi elo Kolkatar train,” as though it surely bore the scent of some of our many relatives and friends who resided in Kolkata. As a child, I would rush up the steep steps to the terrace and watch the train go by, silhouetted against the horizon and whistling away merrily, prompting me to count once again the days to the winter holidays when we would be boarding it for our annual trip to Kolkata. Over the years, the Hindustan Steel Co. took over the paddy fields and built hundreds of multi-storied homes to house their employees, replacing the lush green, later golden yellow rice plants, swaying gently in the breeze, with concrete.

However, they couldn’t take away my love for trains. Even as I left home to attend college in Kolkata, three times a year, the same train gently carried me back to my home in Ranchi, chugging and swaying until I drifted off to a sound, secure slumber for the night. During our travel through the UK last year, we often boarded the train between cities enjoying the beautiful green meadows dotted with sheep or an occasional remnant of a castle ruin. We loved these journeys so much that we made similar travel plans during our recent trip to Spain, Portugal and Morocco, once again watching with rapt fascination the perfectly lined olive groves or the equally neat wine orchards rising gently up to the breathtakingly beautiful hills. So much more reliable and comfortable than air travel, or so we thought!

We were on our way from Barcelona to Madrid on the 1pm train. It was a three-hour journey, and we were looking forward to the promise of breathtaking vistas along the way. The station was crowded, and we soon realized that we had been standing in line longer than expected and there had been no movement at all in any of the queues that had started before us. The murmurs that had begun mentioned a power outage and we noticed that the lights in the station had turned off for a bit, turned on again and now were completely dead. The elderly lady next to us felt unwell and was tenderly helped outside by her younger relatives.

Eventually we were told to vacate the station, spurring a mad rush for any available shade outside. I had finally managed to maneuver my cumbersome suitcase through the door and spotted my husband on the phone, standing right next to the lady who was obviously still very unwell and needed space around her. I beckoned to him to follow me as I looked for a spot close to the building and in the shade. Now, husbands actually do follow their wives but only in cartoons, so I turned around to check just as the wheels of my suitcase caught something on the pavement and toppled over, pitching me against the glass outer wall of the station. I saw several stars, immediately began sprouting a large lump on my right temple, and as I sat up trying to clear my vision saw my husband staring at me incredulously. He hadn’t seen me fall and was perhaps wondering why I was sitting on the dirty pavement, but never mind, he had followed me after all.

By this time the murmurs had turned into fact—there was a power outage across Spain, Portugal and Southern France and now there were speculations about when we would be able to resume our journey, and if at all that day. We found ourselves in conversation with a couple from the USA who were now living close to Barcelona and another young pair from Venezuela who were making a trip through Spain. Cherie was on her way to Madrid to shoot a Coca Cola commercial and was determined to wait until she received a notification of cancellation. Folks mulled around aimlessly, some munching on what snacks they had, others offering them to perfect strangers. With realization dawning on us that the trains would not be moving any time soon, we humbly turned down the gracious offer of a bed for the night from Cherie and Greg and decided to explore the options for taking a bus to Madrid. So we went over to stand at the back of the long line that had already formed for taxis.

When it was finally our turn to board the cab Enmanuel and Annabell seemed to appear from nowhere and requested a ride with us. We were, of course, happy to oblige. From that moment on these two turned into our Guardian Angels, watching out for us, helping with our luggage, checking into the dwindling options for travel and becoming our interpreters as needed. With the internet not in service anymore, we were unable to get

seats on the bus and wandered around in an aimless, unsure trance for a while, before hailing a cab to take us back to the station. However, another incident awaited us. In his haste the driver started pulling out before Sumit had pulled his leg into the car and his foot got caught under the wheel. Completely confused by Sumit's frantic gestures, he actually started moving forward until Enmanuel shouted at him in Spanish to reverse. Sumit had twisted his leg but thankfully managed to escape his foot getting crushed under the wheel.

The return to the Railway station revealed a discouraging spectacle, throngs of people were seated on the ground waiting for the doors to open. We therefore had a consultation leading to, what we realized later, a wise decision. The line outside the one operating restaurant was long, but we stood there anyway using this opportunity to get to know each other more. Enmanuel and Annabelle were planning to get married later in the year and were on a trip through Spain in the meantime. Enmanuel had loved Austin when he visited and hoped that his degree in computer science would find him a job in the US if ever he became fortunate enough to procure a visa. However, as their parents waited in Florida with the threat of deportation looming large every day, they realized that this was but a fading dream. The hope that her mother would at all be present at the wedding was fading too as venturing out of the country posed the risk of being unable to return. So, at the moment they were residing in Santiago, Chile, working, traveling and trying to make the most of their young lives.

In the course of the next several hours we became quite adept at scrambling despite our bulky luggage. We scrambled to get into the restaurant and again to procure a table, food was ordered and consumed without much reflection and once the doors of the station were opened, there was another fanatical scramble, bordering on stampede, for the obviously insufficient number of benches available for the large crowd. Unable to procure one, we were searching for an ideal spot on the floor for the night, when I noticed they were pushing in more benches from another location. I suggested to Sumit that he stand near the door so he could grab the next one, which he did. Unfortunately, there were others trying to pull it away from him causing him to shoo them away, "No! No! This is mine! Mine!", bringing into mind the seagulls in the movie "Finding Nemo." Once again Enmanuel jumped to the rescue, pushing the hopefuls away, helping Sumit pull the bench over to an acceptable location, and finally the four of us planting ourselves firmly on it to ensure our claim. The metal chairs on the bench were not the most comfortable and eventually, Annabell slid down to sleep on the floor while the three of us remained seated, staring in envy at the family in sound slumber on an air-mattress that they had serendipitously brought along.

Thus passed the night, with Annabell sound asleep, Sumit and Enmanuel dozing and shifting in the quest of a more comfortable position and me wide-awake, watching the crowd and in particular a group of small children taking advantage of the situation to play through the night, pacing when my joints hurt from sitting.

As morning arrived after what seemed like the longest night ever, hope crept back to us, and we made our way towards the office to await any developments. The crowd was getting restless and the chants against the authorities were getting louder, the folks in the office had suddenly vanished and Police along with their dogs were marching in, alongside passengers who held tickets for the day. A railway staff member we had spoken to earlier explained to us that the day passengers would board their respective trains first and any remaining seats would be filled by the passengers waiting from the previous day. He asked us to wait for a signal from him and Annabell quietly guided us to a location that would allow us to make a dash for the train when the signal came. However, when it was time, there was a surge from behind that almost knocked me to the ground and the officer had to rush over to hold them at bay so we could continue running with our luggage towards the compartment allocated for us. Annabell secured a table for four inside while Enmanuel pulled us and our luggage into the train. The relief to be in the train was overwhelming and we patted ourselves on the back as we shared our dwindling snacks for breakfast before the three started dozing off. I found myself placing my nose on the window to watch the landscape, still beautiful, rushing past.

My love for trains was still firm and remained unaffected by this harrowing experience, one that could easily dissuade us from using this means of transportation again. Later we heard of yet more distressing stories of planes having to land at nearest airports and trains stranded in the middle of nowhere with water and restroom facilities becoming scarce. Looking back, ours was an adventure that we would remember forever. We had acquired new friends who we are still in communication with, our faith in humanity was still intact, and we had much to be thankful for as we resumed our journey through Spain, Portugal and Morocco.

*Lord Shiva & Goddess Parvati - Ishani Gupta*

*Pujarini - Paramita Dasgupta*

*Nivasha Lake Kenya Birds Planet - Rumku Chowdhury*

# The hike to Grinnel Glacier

Mahati Ramya Adivishnu

**Glacier National Park**

Imagine a place where jagged peaks touch the clouds, turquoise lakes sparkle in the sunlight, and waterfalls tumble through lush alpine valleys. That's the magic of Glacier National Park, nestled in northwestern Montana along the Canadian border. Known as the "Crown of the Continent," the park feels like stepping into another world—wild, untamed, and breathtaking at every turn. With over 700 miles of hiking trails, visitors can wander through ancient forests, climb into glacier-carved high country, and share quiet moments with grazing mountain goats or the occasional grizzly spotted in the distance.

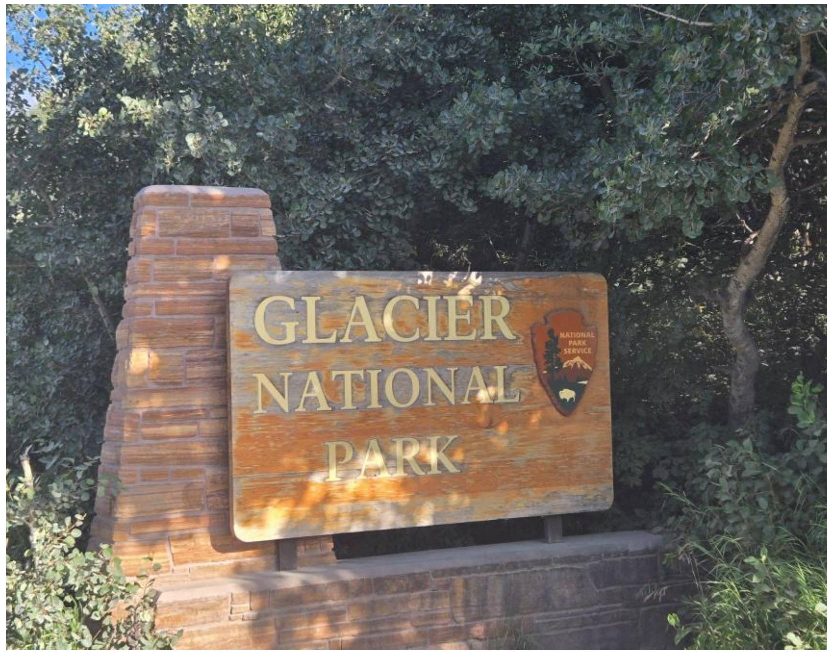


At the heart of it all lies the park's crown jewel: the Going-to-the-Sun Road. This 50-mile stretch of highway is more than just a drive—it's a journey into the soul of the Rockies with waterfalls, mountain peaks, lush forests, and a beautiful view of valleys. It's no wonder that nearly three million people make the pilgrimage here each year, squeezing into the fleeting summer months between July and early October, when the road finally opens.

For those who love the call of the trail, Glacier National Park is nothing short of paradise—a rugged sanctuary that ranks among the most spectacular national parks in the United States. Getting here is part of the adventure itself. The closest airport sits in Kalispell, Montana, but seasonal Amtrak service offers another scenic option. Many travelers, however, choose to fly into Bozeman, where more budget-friendly flights are available, and then make the 4.5-hour drive.

Once inside the park, a pass is required, and during peak summer months, so is a reservation to drive the iconic Going-to-the-Sun Road from the west side.

**Grinnel Glacier**

One of the most spectacular trails is the Grinnell Glacier Trail. Stretching 11 miles round-trip with a 1,500-foot climb, it's a challenging yet deeply rewarding trek. For those wanting a shorter journey, a boat ride across Swiftcurrent Lake and Lake Josephine trims the hike to about 8 miles. Along the way, the scenery feels like a moving canvas—glacial valleys opening up to sweeping views, turquoise alpine lakes sparkling in the sunlight, waterfalls cascading down cliffs, and finally, at the trail's end, the dramatic sight of Grinnell Glacier itself, where floating ice blocks drift across the shimmering water. It's the kind of hike that stays with you long after you've left the park.

**The 11-mile hike**

In July 2025, there is construction happening in the Many Glacier area. So, we had to reserve shuttle tickets on the nps.gov website ahead of time. These tickets are very difficult to get. Another option would be to reserve a pickup and drop off with Blackfeet Indian reservation taxi services.

We parked at the designated place, entering the park from the East side, and took the shuttle to the Many Glacier hotel. Many glacier hotel is good place to have breakfast, fill water bottles, use restrooms, and start

the hike of the day. Before starting our hike, we checked at the ticket desk if we could get return tickets for
the boat. Fortunately, we got the tickets for the return boat, which will cut 2 miles from our hike. That's such a relief, as we are hiking with kids (one is 10 yr old).
We started our hike at around 9.40 am from the trailhead near to Many Glacier hotel. We passed through Swift Current Lake and walked around Lake Josephine, and then the trail started climbing some elevation. The views are great! We strolled along the narrow, winding trail with gorgeous lake views keeping us company on both sides.

The hike is easier so far. We took breaks at least every 1.5 to 2 hrs. We carried 2 liters of water per person and many protein bars, yogurt cups, and muffins. We used our walking sticks as well to reduce stress on our knees. These precautions helped us a lot. After around 11 am, the hike became more challenging as we were climbing more elevation and started to see the first view of the alpine lake 'Grinnel Lake'.

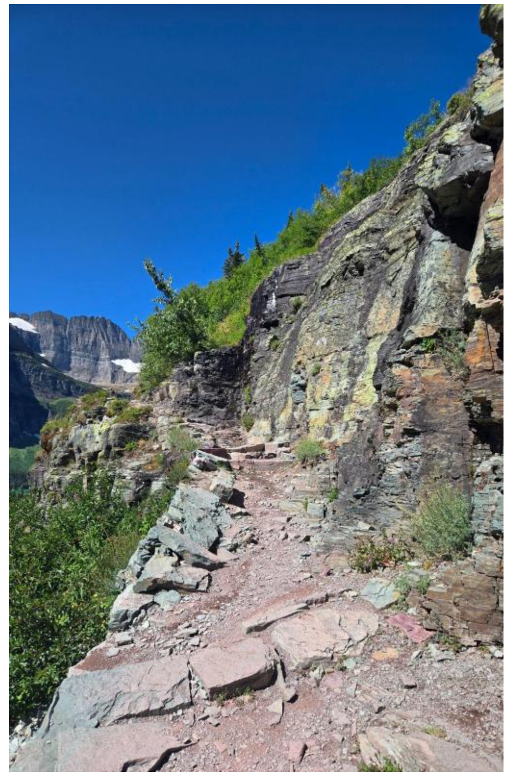

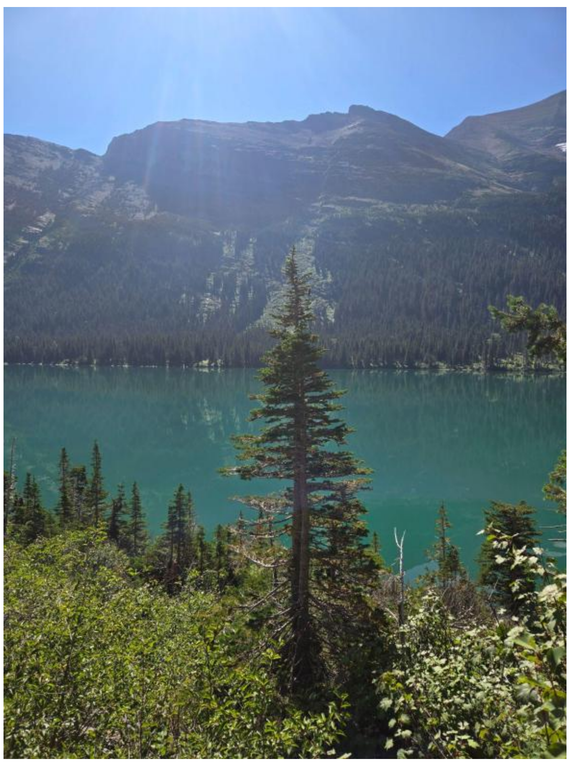

It continues to climb more from here, and it was strenuous. We saw a mountain goat very near the trail. We had to wait until it went. There is a pit toilet around 1.5 miles from Glacier, I guess. We took a rest and enjoyed some snacks, taking in the view. We could see many mountain goats on the mountains. Fortunately, we didn't see any bears, but we carried bear spray for safety as this is bear country.

We crossed many waterfalls on the way, even drenched by some. We took hundreds of photos capturing the alpine lakes and waterfalls. All photos are Instagram-worthy for sure.
The last part of the trail is a steep incline, and it was hard. Huffing and puffing, we reached the Grinnel glacier. The photos don't do any justice. The glacier, an icy lake with ice blocks, the greenish color of the water, the waterfall near the glacier - it's an unforgettable scenery in our lives.

Our hearts full of joy, we relaxed, dipped our feet in cold water, which was refreshing. We had snacks and started our way back. The return trip is more stressful than the onward hike. It was more stressful on our knees as we were walking down. The hiking sticks really helped.

We returned to the boat dock by 5.40 pm, tired and our legs sore. Our boat returned to the Many Glacier hotel, where we could grab a snack, rest until our shuttle came to pick us up.

That's about the 11-mile hike to the Grinnel Glacier. Hope you loved reading about our adventure and fun.

# Congratulation !
## Recent Graduates

**Sambit Kanjilal**
Graduating from:  Westwood High School
Going to : UT Austin
Major : Computer Science

**Nishka Sen**
Graduating from: Westlake High School
Going to : UT Austin
Major : Chemical Engineering

**Loy Bhowmick**
Graduated From: Westwood High School
Going to: UT Austin
Major : Neuroscience

**Kritanko Chakraborty**
Graduating from : Westwood High School
Going to : PennState / Sidney Kimmel Medical College
Major: 7 year Accelerated medicine (BS/MD)

**Dillon Pratim Dey (Jojo)**
Graduating from: Vandegrift High School
Going to : Arizona State University
Major : Business/Finance major

**Aditya Jas**
Graduated From: Westlake High School
Going to: UT Austin
Major : Electrical and Computer Engineering

**Aarohi Bhattacharya**
Graduating from : Westwood High School
Going to : University of Illinois Urbana -Champaign (UIUC)
Major: Biomedical Engineering

**Ronok Ghosal**
Graduating from : WestLake High school
Going to : CalTech
Major : CS and Maths

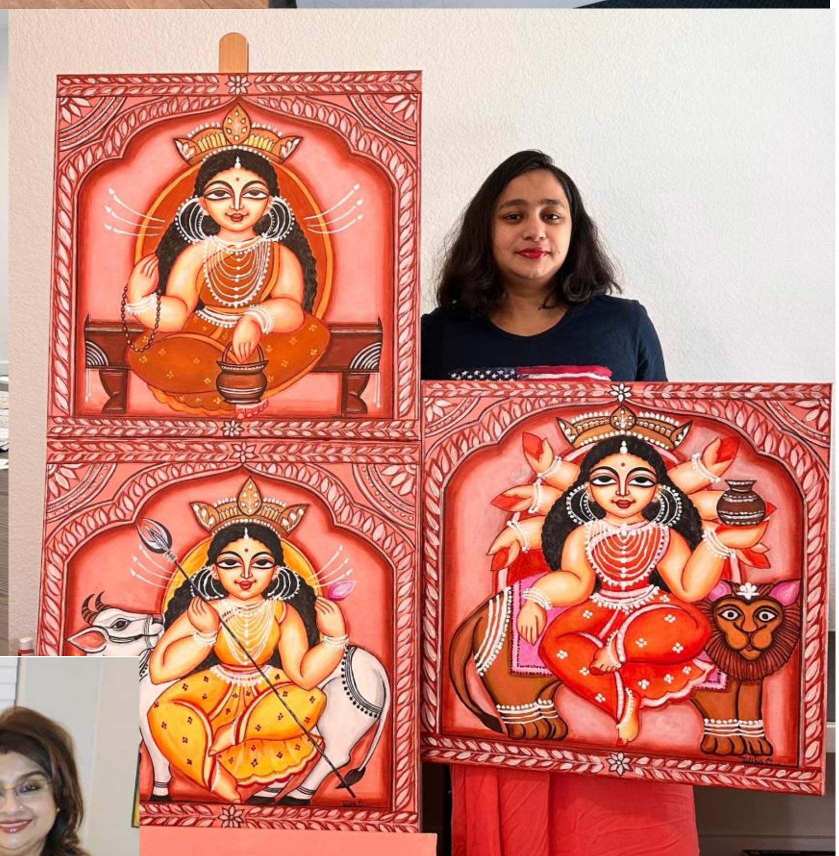

# CTBA Pandal Decoration team in action behind the scenes

*Ganesh - Cynthia Ceil*


**Mathews**
CPA Inc.

1908 Yaupon Trail Ste 102 Cedar Park TX 78613
Tel 512-980-1000 | Fax 512-528-5498

9415 Burnet Rd Ste 107 Austin TX 78758
Tel 512-710-1000 | Fax 512-528-5703

5871 Victoria Ave Ste 101 Montreal QC H3W2R
Tel 438-922-9060 | Fax 866-804-4337

**Mathews Chacko**
Certified Public Accountant
IRS Acceptance Agent

E: mathews.chacko@mathewscpainc.com

www.mathewscpainc.com

SIJO VADAKKAN
BROKER, GRI, CNE
TRINITY TEXAS REALTY INC.
Integrity and Excellence in Real Estate
512 740 2262/512 279 4596
sijo@trinitytxrealty.com
2251 S Bagdad Rd, Bldg1,Ste 101-102, Cedar Park, TX 78613.
www.trinitytexasrealty.com